KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৯ টিপু সুলতান রোড, কল-২৪
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রকাশিত (অমী পাত্র)
Title : অর্বাচীন	Size : ৮.৫"/৫.৫"
Vol. & Number : ৭	Year of Publication : 1997
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অমী পাত্র	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অর্বাচীন

ইঁদুরদের
দৌড়
ঝাঁপ্
কমে
আসছে
লক্ষ্য
করুন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

তাড়াতাড়ি হাড়গুলো ফাঁক করে দেখি তার ভেতর অনেকটা সকাল পড়ে
আছে কিনা শব্দেরা মজ্জায় ঘুরে ফিরে বাসা বাঁধে ফেটে যাওয়া পুরোনো
শিরায় আমার এই শরীর তবু আসমানী সভ্যতা জানে আততায়ী স্বপ্নের
মতো ভরে রাখে রক্তের শ্বেত-গুলে ছায় রঙিন আয়ন প্রজাপতি ভাঙা
দেওয়ালের গর্ত বরাবর শুয়ে থাকি আমরা প্রাণী হীন অনেকটা জড় শব্দের
পৃথিবীতে রক্তের চাঁই ধ'রে ঝুলে থাকা হাত আমাদের অচেনা সাজানো বুকের
ভেতর ভালোবাসা কালো হয়ে আছে বলে সোহাগের সবুজ দেখে ঘাবড়াই
আঁচড়ে ভেঙে ফেলি সব রঙ বরং একটুকরো আরো একটা কালো রাখা থাক
তোমার জন্য

শর্মী পাণ্ডে
শিলাবৃষ্টি '৯৭

AND THE SIGN SAID THE WORDS OF A PROPHET ARE WRITTEN ON THE SUBWAY WALLS

এপ্রিল '৯৭ থেকে গ্রাফিত্তির সমস্ত বইপত্র নেড়ে-চেড়ে দেখতে পারবেন কোলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট বেসমেণ্ট হলে। আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় না। গ্রাফিত্তির সমস্ত বইয়ের জন্য মূল ঠেকে যোগাযোগ করুন।

একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিরোধীরাই জীবিত ও সৃষ্টিশীল

অঁতন্যাঁ আর্তো

তিন টুকরো

১. না, আর কোন আকাশ নেই

দ্বিতীয় মুভমেন্ট

মঞ্চে দৌড়চ্ছে লোকে, আকাশের দিকে দেখিয়ে বলছে—

'ঐ যে, ঐ যে, কী ওটা, তাহলে ?'

'না, ওখানে নয়। ঐখানে, আমি বলছি ওখানে।'

'ওদিকে-ওদিকে—তাকাও, তাকাও ওদিকে। বলতে চাইছি ঠিক ঐ জায়গাটায় দেখ।'

বৃদ্ধ একটি লোক লাঠি হাঁকড়ে উচ্চকণ্ঠে চেঁচায়, এত নির্লজ্জ ভাঁওতায় খেপে আগুন—'রাত দশটা বাজে, ওটা কী ? চাঁদ না সূর্য, অ্যাঁ ? চাঁদ না সূর্য—কী ওটা ?'

সাধারণ লোক : চাঁদ। আচ্ছা গাধা, শিং-লাগানো চাঁদ দেখনি ?

শিশু : মা, আলো নিভে গেলে তুমি কি অন্ধ হয়ে যাবে ?

ট্র্যাফিক পুলিশ হাত দেখাচ্ছে। কেউই থামছে না।

এক মহিলা এগিয়ে আসে—

'আচ্ছা, বলতে পারেন, যদি একটা যুদ্ধ লাগে কী প্লেগ হয়, ওরা কি আমার কুকুরটাকেও চাইবে ?

হুড়োমুড়ি পড়ে যায়, একঝলক দেখার জন্য সকলে পাগল। পরপর লোকে মঞ্চের একদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

'ঐ যো, গাধা, ঐখানে।'

'আকাশে, আকাশে প্রলয়, মহাপ্লাবন।'

'চাঁদ পড়ে যাচ্ছে। আমি বলছি তোকে, চাঁদটা পড়ে যাচ্ছে। দেখ্, ওখানে দেখ্, কীর'ম ঝুলে পড়েছে, পড়ে যাচ্ছে, মাইরি।'

'পড়তে দে, সব শালা নরকে চলে যাক।'

'ওদের বলে দাও অগাস্টাস ওল্ডাস, কোথা থেকে আমার প্রেম এসেছে।'

'সব প্রেমের ব্যাপার, নীল খিলানটা পড়ে যাচ্ছে।'

'ঐ, ওখানে দেখ্, ঐ যে ওখানে এক নাট্যকবি।'

'চোপ্। অনেক লাটক হয়েছে। চেপে যা। যত সব খোয়াব-দেখানের দল। শুয়ে পড়ো—যাও।

মঞ্চের দু'দিকে লোকে সার বেঁধে দাঁড়ায়।

মঞ্চের মাঝখান অন্ধকার হয়ে যায়। চিৎকার, অভিযোগ, ডাক, প্রতিবাদের মধ্যেও লোকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার জন্য প্রাণপণ করছে।

'আরে, ঠেলছ কেন? পড়ে যাব যে।'

'কে? পড়ে যাবে, কে তুমি বাওয়া, আকাশ?'

'এত তাড়াতাড়ি নয় বাবা, যথেষ্ট ভারি তুমি।'

'হা ঈশ্বর! তাহলে এসব সত্যি, অ্যাঁ, সব সত্যি।'

খবরকাগজ নাড়তে-নাড়তে হকাররা অন্ধকার মধ্যমঞ্চে ছড়িয়ে যায়। মহৎ অবোধ্য স্বপ্নকণ্ঠে চেঁচাতে থাকে তারা—

'বিরাট আবিষ্কার। বিরাট আবিষ্কার লিয়ে যাও। সরকারি। বিজ্ঞান পুরো থ। সব সরকারি বাওয়া, আর আকাশ না। কোন আকাশ নয়।'

'কী বলছে? এ্যাঁ কী বলছে ওরা, কী নিয়ে কথা বলছে?'

'কোন আকাশ না, হ্যাঁ। সরকারি। বিস্ময়কর আবিষ্কার। বিজ্ঞান হতবুদ্ধি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার। কোন আকাশ নয়।'

নীরবতা। তারপর দূর থেকে কণ্ঠধ্বনি জেগে উঠতে-উঠতে খবরের বিস্তুরা আবার ঢুকে পড়ে। 'সিরিয়ুস' শব্দটা চতুর্দিক থেকে বিচিত্র স্বরে ও সুরে ক্রমশ বাড়তে থাকে।

'সিরিয়ুস···সিরিয়ুস···সিরিয়ুস ইত্যাদি। সরকার শান্ত থাকতে হুকুম করছে।'

'শুয়ে পড়ো, যত সব খোয়াব-দেখানের দল। স্বপ্নচারীর দল, লটকে যাও বিছানায়।'

'কিছুই বুঝছি না, কী হচ্ছে। ভয় পাচ্ছি, ওফ্ যথেষ্ট হয়েছে, আমি পুড়ছি।'

'ও মা, হচ্ছে, ব্যাপারটা ঘটছে, দেখতে পাচ্ছি জিনিশটা পড়ছে।'

'কাগজে কী বলছে, দেখ বাবা। আমি তো একবর্ণও বুঝছি না। কী হচ্ছে?'

'সরকারের হুকুম, চুপ মারো।'

খবরকাগজ হাতে নিয়ে একটা লোক দৌড়ে মঞ্চের সামনে আসে।

'দেখ, দেখ, এখানে। আমি জানি, শোন। এই-ই সত্য।'

নীরবতা নেমে আসে। সে পড়তে চেষ্টা করে। মঞ্চের ধারে আবার গোলমাল শুরু হয়, যেন লোকে এখুনি পৌঁছল, জানে না কী হচ্ছে, কিছু শোনেওনি।

'কিন্তু এ তো স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক কিছু কী?'

'আমি ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি।'

'দেখ, আবার শুরু হয়েছে···কী হয়েছে?'

নীরবতা।

স্ট্রেচারে করে একটা শরীর নিয়ে যাওয়া হয়। লোকে দৌড়ে এগিয়ে আসে একবার দেখার জন্য।

একটা লোক তার পিছন-পিছন যায়। মহিলা তাকে থামায়।

'ডাক্তার, এটা প্লেগ নাকি?'

'না, অবশ্যই নয়, এটা হলো…'

ডাক্তারের উত্তর চিৎকারে ডুবে যায়।

'কী ঘনিয়ে তুলছে ওরা?'

'আমি দেখেছি গুরু, পড়ছে না, ব্যাপারটা আসলে চুম্বকের।'

'মোটেই না, উল্কার গুচ্ছ ওটা।'

'গর্দভ, ওটা বিদ্যুৎহীন বজ্র।'

'এঃ, মোটেই তা নয়, এ হলো বিদ্যুৎ-ছাড়া আলোর ঝলকানি।'

'গাধা কোথাকার!'

নীরবতা। খবরকাগজ হাতে লোকটা আরও এগিয়ে যায়।

নীরবতা।

লোকটা বলতে শুরু করে। কিন্তু একদল লোকের আড়ালে চাপা পড়ে যায়, আর দেখা যায় না তাকে। দর্শকের দিকে পেছন করে সকলে মঞ্চের পেছন-দিকে কী দেখতে থাকে।

মাইকের চিৎকার সব ঢেকে দেয়:

'দুর্দান্ত আবিষ্কার। আকাশকে বাস্তবিক ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। পৃথিবী সিরিয়ুস থেকে আর মাত্র এক মিনিট দূরে। আর আকাশ নয়। আন্তর্নাক্ষত্রিক বার্তাব্যবস্থার সূচনা হয়েছে। গ্রহান্তরের ভাষা স্থাপিত হয়েছে।'

লোকে খুশি। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। হাসি ফেটে পড়ে। ভিড় হাল্কা হয়। যে যার নিজের ক্ষুদে খেলায় ফিরে যায়। মেয়েদের খোঁচা মারে তারা, মেয়েরা তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়ে।

একটি লোকের স্বগতোক্তি:

'তবু আমি কিছু বুঝলাম না। যাই হোক, এতে কী এসে যায় আমাদের? ভেঙে-পড়ার মতো কিছু হয়েছে কী?'

লোকটি বেরিয়ে যায়।

সামান্য কিছু লোক বেড়াচ্ছে। প্রেমিক-প্রেমিকারা ছড়িয়ে পড়ে। একটা পসারী। আলুথালু একটা লোক।

কণ্ঠস্বর:

'বুঝলে তো, এর ভিত্তি হলো…'

'হ্যাঁ গুরু, বিরাট শক্তির মুক্তি হবে।'

'মোটেই শক্তি নয়। আসলে বাষ্পীভবন।'

'কী…?'

'বস্তুর অবসংগঠন, অবনির্মাণ।'

'পৃথিবী খতম। এভাবে তুমি শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারো না। আসলে দুটো পৃথিবী পরস্পরকে ঠেসে ধরেছে, বুঝেছ।'

'পৃথিবী যেন আকাশটা উড়িয়ে দিয়েছে।'

(শেষটা ব্যাখ্যা)

কথা বলতে-বলতে একটা লোক উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

চ্যাংড়ারা কথা বন্ধ করে না।

লোকটা দেখে মনে হয় হাইড পার্কে হাততালিজব্দ কোন নীতিপ্রচারক।

'প্রেম, বুঝলে, তুমি অন্য কেউ হয়ে গেছ, ব্যস্ এছাড়া আর কিছু নয়। তুমি নক্ষত্র হয়ে গেছ, এটাই কীভাবে এই ব্যাপারটা হলো তার রহস্য। তা-ই নিয়েই ভাষা। কথা বলছ না, কিন্তু সব কিছু আছে। বুঝেছ, সব কিছু সেখানে আছে তুমি তা বলার আগেই। নক্ষত্র এবং আগুন। তুমিই আগুন।'

সেই মুহূর্তে দূরে বিপ্লবের গান শুরু হয়। □

২. রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র

রাস্তায় প্রস্তাবিত দৃশ্য,
পুলিশ কি ছেড়ে দেবে, পুলিশ কি অনুমতি দেবে ?
অবশ্যই বলব যে আধুনিক রাস্তার আবহ
মোটেই নাটকীয় নয়,
তাই
আমার পরিবেশ আমাকেই খুঁজে বার করতে হবে, পরিবেশ,
ঝোড়ো দিন, ঝোড়ো আবহ,
গতিদর্শন থিয়েটার,
যতই হোক রাস্তায় তো আর মহড়া দিতে পারো না,
যতই হোক সব কিছু টাকায় বাঁধা, টাকা বা তার অভাবই সব আটকে দিয়েছে,
এমন সব উপাদান জোটাতে হবে, যার জন্য তেমন কোন খরচ নেই :
কাঠকুটো, ক্যানভাস, খাদ্য এবং অভিনেতা
টাকা ছাড়াই এসব পাওয়া যেতে পারে, অথবা বিনিময় করা যায়,
প্রয়োজনীয় জিনিশের একটা সমবায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

সংক্ষেপে, কী কী চাই ?
খোলা জায়গায় অভিনয় করা যায়, যদি আবহাওয়া ভালো থাকে, নইলে
একটা ঘর,
অথবা একটা হ্যাঙ্গার, ফ্যাক্টরি বা গ্যারাজ,
মহড়া কিন্তু দিতেই হবে।
আমি দেখিয়ে দিতে পারি যে টাকা ছাড়াই এসব করা যায়,
থাকার একটা জায়গা দিন,
একটু খাদ্য,
বৈষয়িক লোকেরা কাপড় কেটে বানাক দারুণ পোশাক,
সমাজের ভেতরে আর-একটা সমাজ,
রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র। □

৩. ব্রেখ্ত-আর্তো কথোপকথন

প্র: আমাদের জীবনের সংগঠনে ও অসংগঠনে সুররিয়ালিজমের কি এখনও কোন গুরুত্ব আছে ?
উ: সব কাদা, ক্লেদ, যদিও সব ফুলের তৈরি।

প্র: আরও কতবার আপনি মনে করেন যে প্রেমে পড়বেন ?
উ: রক্ষীঘরে এক সৈন্য দাঁড়িয়ে, একা। পকেট থেকে বার করে একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছে, একা।

প্র: আপনার জীবনের সংগঠনে মৃত্যুর কি কোন গুরুত্ব আছে ?
উ: এখন তো শুতে যাওয়ার সময়।

প্র: চিরন্তন প্রেম কী ?
উ: দারিদ্র্য পাপ নয়।

প্র: রাত্রি, না ঘূর্ণিঝড় ?
উ: ছায়া মাত্র।

প্র: প্রেমের ক্ষেত্রে কী সবচেয়ে বিরক্ত করে আপনাকে ?
উ: ওঃ প্রিয় বন্ধু, তুমি, আর আমি। □

রূপান্তর ঃ সন্দীপন ভট্টাচার্য

পল গগ্যাঁ

ভিনসেণ্ট ভ্যান গঘ

বহুদিন ধরেই ইচ্ছে ভ্যান গঘকে নিয়ে লেখা আর কোন এক শুভদিনে ভালোমন নিয়ে বসে করব : এখনকার মত আমি তার স্মৃতি, কিম্বা বলা ভালো, আমাদের দুজনের স্মৃতি হাতড়াচ্ছি ; তুলে আনতে চাইছি সেই স্মৃতির বিশেষ কিছু অংশ যা প্রচলিত কিছু ভ্রান্তিকে দূর করবে। এটা বোধহয় নেহাৎই কাকতালীয় ঘটনা যে এ জীবনে বহু মানুষ যারা আমার সঙ্গে একদা সময় কাটিয়েছে এবং আমিও যাদের সান্নিধ্য ও কথোপকথন উপভোগ করেছি তারা অনেকেই পরে উন্মাদ হয়ে গেছে।

এবং এ ঘটনা ঘটেছে ভ্যান গঘের ক্ষেত্রেও। আর কিছু লোক একান্ত অসৎ উদ্দেশ্য অথবা নেহাৎই ভ্রান্তি থেকে প্রচার করতে চেয়েছে যে ঐ উন্মাদনার জন্যে আমিই দায়ী। নিশ্চয়ই, বিশেষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে একজনের অন্যের ওপর প্রভাব থাকে, তবে সে প্রভাব একজন বন্ধুকে উন্মাদনার দিকে ঠেলে দেবে, এ কথা হাস্যকর। ঐ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে যে উন্মাদাগারে ভিনসেণ্টের চিকিৎসা চলছিল সেখান থেকে সে আমাকে লিখেছিল :

'কী ভাগ্যবান তুমি যে তুমি পারিতে আছ! এখনো পারিই সেই জায়গা যেখানে প্রখ্যাত চিকিৎসকদের দেখা যায়। তুমি অবশ্যই সেখানকার কোন বিশেষজ্ঞকে দেখাবে তোমার পাগলামি সারানোর জন্যে।'

আমরা সবাই-ই কি কিছুটা উন্মাদ নই? যেহেতু তার সেই উপদেশটি ছিল ভালো তাই শুধুমাত্র বিরুদ্ধতা করার জন্যই আমি তার অনুসরণ করিনি।

'ম্যরক্যুর-এ'[১] ভিনসেণ্টের চিঠি যারা পড়েছেন তাঁরা জানেন একটি চিঠিতে কী ভীষণ আন্তরিকতায় সে চেয়েছিল যে আমি আর্ল-এ গিয়ে একটি ওয়ার্কশপ বানাই এবং তার কর্ণধার হই।

---

* এই লেখাটি গগ্যাঁর আত্মজীবনী 'আভঁত এ আপ্রে'-র

আমি তখন ব্রিটানির পোঁ-এ্যাভেঁ-তে কাজ করছিলাম। সেখানে কাজেকর্মে আমার আটকে পড়ার জন্যই হোক অথবা আমার সহজাত বোধের সেই আশঙ্কা, যে ওখানে গেলে আস্বাভাবিক কিছু ঘটবে, তার জন্যই হোক বেশ কিছুদিনের জন্য আর্ল-এ যাওয়া থেকে বিরত ছিলাম। তারপর একদিন ভিনসেণ্টের বন্ধুত্বের তাড়না অগ্রাহ্য করতে না পেরে যাত্রা করেছিলাম আর্ল-এর উদ্দেশ্যে।

আর্ল-এ পৌঁছে আমি ভোর হবার অপেক্ষায় রাতটা একটা সারারাত-খোলা কাফেতে কাটালাম। কাফের মালিক আমায় দেখেই হই-হই করে উঠেছিল, 'আরে আপনিই তো সেই লোক, ভিনসেণ্টের বন্ধু। আমি ঠিকই আপনাকে চিনতে পেরেছি।'

কিছুদিন আগে আমি আমার একটা সেল্‌ফ-পোর্ট্রেট্ ভিনসেণ্টের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তার মাধ্যমেই সে আমাকে শনাক্ত করেছে বুঝলাম।

সকাল হতেই গেলাম ভিনসেণ্টকে জাগাতে। সেদিনটা কেটেছিল গোছগাছ করে, সারাদিন বকবক করে, এবং আর্ল ও আথতেসিয়েন্-এ ঘোরাঘুরি করে ও সৌন্দর্য উপভোগ করে। যদিও শেষোক্ত জায়গাটিতে আমার কোন উদ্দীপনা হয়নি।

পরদিন থেকেই ডুবে গেলাম কাজে—ভিনসেণ্ট তার শেষ না-হওয়া কাজগুলো নিয়ে, আমি নতুন করে। আপনাদের জেনে রাখা ভালো যে কোন অসুবিধা ছাড়াই যেমন বহু চিত্রকরের তুলির ডগায় মস্তিষ্ক-ক্রিয়া লক্ষ করা যায় তা আমার ক্ষেত্রে ঘটে না। অন্যরা অদ্ভুত তৎপরতায় ট্রেন থেকে নেমেই হাতে তুলে নেয় প্যালেট আর কোন সময় নষ্ট না করেই আপনাকে উপস্থিত করে সৌরকরোজ্জ্বল মাঠে। যখন শুখা মরশুম তখন ছবি যেন উড়ে যায় লুক্সেমবুর্গে। আর সেই ছবির নিচে সই : ক্যরোলু দুর্।

আমি এ ধরনের ছবি পছন্দ না করলেও পছন্দ করি তাকে, যে এমন ছবি আঁকতে পারে : সে কত নিশ্চিত, কত প্রশান্ত ও স্থির—আর আমি কী অনিশ্চিত, কী অস্থির!

যেখানেই আমি যাই সেখানে আমি কিছু সময় নিই থিতু হতে এবং বুঝতে চেষ্টা করি বুঝলতাপ্রকৃতির স্বরূপকে—কত বিচিত্র, কী চঞ্চল সেই অধরা স্বরূপ যা কখনোই চায় না মূর্ত হতে, প্রকাশমান হতে।

সুতরাং বেশ কয়েকদিন আমার কেটেছিল আর্ল ও তার পরিপার্শ্বের সুতীব্র গন্ধময় প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে। যদিও এর জন্যে ভিনসেণ্ট বা আমার

কাজ ব্যাহত হয়নি। আমাদের দুজনের মধ্যে সে ছিল দুরন্ত আগ্নেয়গিরি আর আমার মধ্যেও ছিল আগুনের প্রজ্জ্বলন, কিন্তু তা সুপ্ত। একধরনের সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী।

প্রথমেই যা আমাকে বিব্রত করেছিল তা হলো বাড়িতে সর্বত্র চূড়ান্ত অগোছালো ব্যাপার। তার রঙের বাক্সতে কখনোই মুখখোলা চ্যাপ্টা রঙের টিউবগুলো সব আঁটত না। এতৎসত্ত্বেও সেই বিপন্ন পরিবেশে সবকিছু জলজল করত তার ক্যানভাসে, তার কথায়। দোদে দো গঁকুর আর বাইবেল ছিল এই ডাচ যুবকের মস্তিষ্কের জ্বালানি। আর্ল-এর সব জেটি, সব নৌকো এবং গোটা মিডি-ই তার কাছে হয়ে উঠেছিল অন্য এক হল্যাণ্ড। এমনকী কী করে ডাচ লিখতে হয় তাও সে ভুলে গিয়েছিল। ভাইকে লেখা তার প্রকাশিত চিঠিগুলি থেকে দেখা যায় যে সর্বদা সে ফ্রেঞ্চেই লিখত এবং লিখত অনবদ্য সাবলীলভাবে।

তার বিপর্যস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে থেকে উঠে আসা সঙ্কটময় মতামতগুলির যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা খোঁজার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারিনি তার ছবি ও তার মতামতের বিপ্রতীপ অবস্থান। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক মেসোনিয়ে-র সম্পর্কে তার অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং অ্যাংগ্র সম্পর্কে তার তীব্র ঘৃণা! দেগা ছিল তার কাছে হতাশার বস্তু এবং সেজান ছিল এক ঠগ। অথচ মোস্তিসেলি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলত।

যেটা তাকে সবচেয়ে বেশি রাগিয়ে দিত তা হল আমার খুব ছোট কপাল—যা মূর্খতার চিহ্ন হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তার বুদ্ধিমান বলে স্বীকার করা। এসবের মধ্যেও তার ছিল অন্যের প্রতি সহমর্মিতার গস্‌পেল বর্ণিত স্নেহ ও নম্রতা।

প্রথম মাস থেকেই লক্ষ করছিলাম আমাদের যৌথ অর্থভাণ্ডারের অবস্থাও এখানকার স্বাভাবিক অব্যবস্থার শিকার। কী করা যায়? ব্যাপারটা বেশ সূক্ষ্ম কারণ ঐ টাকার বাক্সে গুপিলে কর্মরত তার ভাই-এর মাসকাবারী সাধারণ বরাদ্দ আর আমার ছবি বিক্রির টাকা থাকত একসঙ্গে। এ ব্যাপারে আমাকে কথা তুলতে হয়েছিল আর তখনই তার তীব্র সংবেদনশীলতার মুখোমুখি হয়েছিলাম। এ জন্য আমাকে নানারকম সাবধানতা অবলম্বন করে তার মন বুঝে ধীরে ধীরে কথা পাড়তে হত যেটা আমার চরিত্রবিরোধী। তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে আমার আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করে প্রতিবার ব্যাপারটা সহজেই উৎরে যেত।

একটা বাক্সেই আলাদা আলাদা করে রাখা হত রাতে বেরনোর, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জিনিশপত্তর কেনার, বাড়িভাড়ার, একটু বেশি করে তামাকের এবং হঠাৎ এসে পড়া কোন খরচের টাকাও। আর বাক্সের ওপর কাগজ পেনসিল, লিখে রাখার জন্য যে কে কোন্ প্রয়োজনে কত টাকা নিয়েছে বাক্স থেকে। অন্য একটা বাক্সে থাকত মূল টাকাটা চারভাগে, চার সপ্তার রাহাখরচ। যে ছোট রেস্তরাঁয় আমরা খেতাম সে হাল ছেড়ে দিতে একটি ছোট গ্যাসস্টোভে আমি রান্না করতাম, ভিনসেণ্ট কাছেপিঠের দোকান থেকে জিনিশপত্তর কিনতে যেত। একবার ভিনসেণ্ট একটা বিশেষ স্যুপ বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি জানি না কী সব মিশিয়ে ছিল সেই স্যুপে—এবং তার ছবিতে রঙ মেশানোর কায়দাতেই নিশ্চয় তা করেছিল। তবে সেই সুখাদ্য আমরা আর খেতে পারিনি। আর প্রিয় ভিনসেণ্ট আমার হাসতে হাসতে বলেছিল Tarascon! La casquette an pere Daudet.[২] এবং দেয়ালে চক্ দিয়ে লিখেছিল :

Je suis Saint Esprit

Je suis sain d'esprit.[৩]

কতদিন, ঠিক কতদিন আমরা একসাথে ছিলাম? ভুলের ফলে আমি তা ঠিকমত বলতে পারি না। তবে দুর্যোগের অনবরত আবির্ভাবে, কাজের দুর্নিবার জ্বরে আক্রান্ত হলেও ঐ সময়টা আমার কাছে একশো বছর বলে মনে হয়। লোকজনের মনে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য না জাগিয়ে সেখানে দুজন মানুষ উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছিল—যা তাদের দুজনের কাছেই ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং হয়ত অন্যদেরও কাছে। নির্দিষ্ট ফলও কিছু ফলেছিল।

আমি যখন আর্ল-এ পৌছই সে সময় ভিনসেণ্ট পুরোপুরি নিমজ্জিত ছিল নিও ইম্‌প্রেশনিস্ট ধারায় এবং সেই কাজ সে করছিল নানা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যা তাকে ক্লেশ দিচ্ছিল : ব্যাপারটা এই যে অন্য কোন ধারার মত এই ধারাও খারাপ ছিল না কিন্তু বলার কথা এই যে ঐ ধারা ভিনসেণ্টের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। সে চরিত্র স্থিরতার থেকে বহু দূরে অবস্থিত। যে চরিত্র ভীষণ স্বাধীন ও স্বাভাবিক সে চরিত্রের সঙ্গে তার বেছে নেওয়া ধারার মধ্যে বিরোধ ছিল।

এই ধারার সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙের ব্যঞ্জনা—বিধিনিষেধ, বেগুনির ওপর নানা হলুদের বাহার—এসব সে করছিলও তবে তা তার স্বাভাবিক অগোছালোভাবে আর সেজন্যই, সেসব ছবি তাকে পৌছে দিচ্ছিল ম্যাড়মেড়ে, অসম্পূর্ণ, একঘেয়ে এক

সৃষ্টির সুরে—সেখানে অনুপস্থিত স্বর্গীয় বীণার মন্ত্রঝংকার।

আমি যে তাকে ছবির কিছু কিছু ব্যাপার শেখাতে চাইছিলাম তা ছিল সহজ কারণ জমি হিসেবে সে ছিল ঋদ্ধ ও উর্বর। নিজস্বতাপূর্ণ, সজীব এবং ব্যক্তিত্বময় সব চরিত্রের মতই সে ছিল আশেপাশের মানুষ সম্পর্কে নির্ভীক ও নমনীয়।

প্রথম দিন থেকেই আমার ভিনসেন্ট অসামান্য উন্নতি করতে লাগল : সে যেন হঠাৎই আবিষ্কার করেছিল, ধরতে পেরেছিল এমন কিছু যা তার অন্তর্নিহিত হয়েও ছিল অধরা—যা সূর্যালোকের মধ্যে হাজার সূর্যের মত দীপ্যমান।

আপনি কি দেখেছেন 'কবির প্রতিকৃতি'?[৪]

১. চুল ও মুখের রঙ ক্রোম্ ইয়েলো

২. জামাকাপড়, ক্রোম্ ইয়েলো

৩. টাই, ক্রোম্ ইয়েলোর সঙ্গে সবুজ, পান্নাসবুজ পেন

৪. ব্যাকগ্রাউণ্ড, সে-ও ক্রোম ইয়েলো

এক ইটালিয়ান চিত্রকর আমায় এ কথা বলে যোগ করেছিল : Shit, Shit, everything is yellow : I don't know what painting is any longer!

এখানে টেকনিকের ডিটেল নিয়ে বিস্তারে যাওয়া অপ্রয়োজনীয়। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ভ্যান গঘ তার নিজস্বতার এক ইঞ্চি ত্যাগ না করেও আমার কাছ থেকে পেয়েছিল ফলদায়ী শিক্ষা। আর প্রতিটি দিন সে এ জন্য আমাকে ধন্যবাদও জানাত। আর যখন সে মঁসিয়ে অরিয়ে কে লিখেছিল যে সে পল গগ্যাঁর কাছে বিশেষ উপকৃত তখন সে আন্তরিকভাবেই সে কথা বলেছিল।

আমি যখন আর্ল-এ পৌছই তখন ভিনসেন্ট তার পথ খুঁজছে। অন্যপক্ষে আমি তার চেয়ে অনেক বড় ও পরিণত মানুষ। ভিনসেন্টের কাছে আমারও কিছু ধার ছিল, সেটা এই যে আমি তাকে সাহায্য করতে পেরেছি, আমি ছবি সম্পর্কে আমার তৎকালীন ধারণা তাকে দিয়েছি। জীবনের নানা সংকটময় সময়ে তার স্মৃতি হাতড়ে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিই যে নিজের চেয়ে কত দুঃখী মানুষ পৃথিবীতে আছে।

তবু যখন আমি নিচের লাইনটা পড়ি তখন আপন মনে হাসি : 'গগ্যাঁর ছবি মোটামুটি মনে পড়িয়ে দেয় ভ্যান গঘের ছবি।'

ওখানে থাকার শেষ দিকে ভিনসেন্ট খুব বদমেজাজি হয়ে উঠছিল। কখনও হঠাৎই চিৎকার চেঁচামেচি করত, তারপরই আবার স্থির। বহু রাত্রেই ঘুম ভেঙে

আমি নিজে চমকে উঠে ভিনসেন্টকেও চমকে দিয়েছি—সে প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত।

ঐ সব মুহূর্তে আমার হঠাৎ জাগরণকে আমি কীভাবে ব্যাখ্যা করব?

অবধারিতভাবেই সে সময় আমাকে গম্ভীরভাবে বলতে হত : 'কী ব্যাপার ভিনসেন্ট?' তখনই সে ফিরে যেত নিজের বিছানায় এবং গভীর ঘুমে তলিয়ে যেত তৎক্ষণাৎ।

যখন সে তার প্রিয় বিষয় সূর্যমুখী নিয়ে স্টিল লাইফ আঁকে সে সময় আমি তার পোর্ট্রেট করব স্থির করেছিলাম। সে ছবিটা আঁকা হলে ভিনসেন্ট বলেছিল : 'তোমার ছবির লোকটা যে আমি তা স্পষ্ট, তবে মনে হচ্ছে সেই আমি কেমন পাগল-পাগল।'

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা গিয়ে বসলাম কাফেতে। তার হাতে হালকা আবসাঁৎ সুরা।

হঠাৎই সে তরলসহ গ্লাসটি ছুঁড়ে মারল আমার মাথা লক্ষ করে। আমি মাথা সরিয়ে আঘাত এড়িয়ে শক্ত করে তার হাত ধরে কাফে ছেড়ে বেরিয়ে পেরিয়ে এসেছিলাম গ্লাস ভিক্তর উগো। কিছুক্ষণ বাদে ভিনসেন্ট নিজেকে আবিষ্কার করল বিছানায় আর তক্ষুনি সে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল, যে-ঘুম ভেঙেছিল পরদিন সকালে।

ঘুম ভাঙতে সে খুব নম্রভাবে আমায় বলেছিল, 'গগ্যা, প্রিয় আমার, আমার আবছা মনে পড়ছে কাল সন্ধ্যায় তোমায় কষ্ট দিয়ে ফেলেছি।'

আমি বললাম, 'আমি অন্তঃকরণ থেকে ক্ষট মনে তোমায় মার্জনা করছি তবে এ ঘটনা তো আবারো ঘটতে পারে আর আমার আঘাত লাগলে আমি যে নিজেকে সংযত রাখতে পারব, তোমার গলা টিপে ধরব না তা বলতে পারি না। তাই অনুমতি দাও ভাই, তোমার ভাইকে জানিয়ে আমি বিদায় নিই।'

ওঃ ঈশ্বর! কী ভয়ংকর সেই দিনটা!

সন্ধ্যা হলে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে মনে হল একা একটু বাইরে ঘুরে আসি, একটু সেবন করি লরেলগন্ধময় বাতাস। 'যখন আমি গ্লাস ভিক্তর উগোয় পৌছেছি তখন শুনতে পেলাম সংক্ষিপ্ত, পরিচিত পদশব্দ যা দ্রুত এবং অসংলগ্ন। তখনই পিছন ফিরলাম আর দেখলাম খোলা ক্ষুর হাতে ভিনসেন্ট আমার দিকে দৌড়ে আসছে। সে সময় আমার দৃষ্টি নিশ্চয় খুব ভয়ানক হয়ে থাকবে; ভিনসেন্ট একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর মাথা নিচু করে উল্টোমুখে বাড়ির দিকে

দৌড়তে লাগল।

আমি কি সে সময় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম? আমার কি উচিত ছিল না ওকে নিরস্ত্র করা এবং তারপর বুঝিয়েসুঝিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করা? বারবার আমি নিজের বিবেককে এ প্রশ্ন করেছি কিন্তু তা না করার জন্য অনুশোচনা আমার হয়নি।

এর জন্য আমায় যে যা ভাবে ভাবুক।

আমি এগিয়ে আর্ল-এর একটা ভালো হোটেলে পৌছে গেলাম। তারপর সময় জেনে, নিলাম রাতের জন্যে একটা ঘর আর শুতে গেলাম।

প্রচণ্ড উত্তেজিত ছিলাম বলেই বোধহয় রাত তিনটে অবধি ঘুম এল না। ঘুম ভাঙল দেরিতে, প্রায় সাড়ে সাতটায়। হোটেল থেকে বেরিয়ে চৌমাথার দিকে গেলাম, দেখলাম বেশ লোক জমেছে সেখানে। আমাদের বাড়ির সামনে আসতে চোখে পড়ল বেশ কয়েকজন উর্দিপরা মিলিটারি পুলিশ আর বাওলার টুপি পড়া বেঁটেখাটো এক ভদ্রলোক যে পুলিশ কমিশনার।

যা ঘটার তা ঘটেছিল এখানেই।

ভ্যান গঘ গত সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই হাতের সেই ক্ষুর দিয়ে বাঁ কানটা কেটে ফেলেছিল। আর সেই রক্তপাত বন্ধ করতে নিশ্চয়ই বহু সময় গিয়েছিল কারণ পরদিন একতলার দুটো ঘরের মেঝের ওপর অনেক রক্তমাখা তোয়ালে দেখা গিয়েছিল।

ছোপছোপ রক্ত পড়েছিল দুটো ঘরে এবং ওপরে আমাদের শোবার ঘরে ওঠার সিঁড়িতে।

কান কাটার পর বাইরে যাবার মত অবস্থা হতেই সে একটা বড় টুপিতে কান-মাথা-মুখ ঢেকে হাজির হয়েছিল হঠাৎ পরিচিত স্বদেশী এক মহিলার[৫] বাড়ি এবং বাড়ির সেন্ট্রির থাকে থামে ভরা ধুয়ে পরিষ্কার সেই কান তুলে দিয়ে বলেছিল: 'এটি আমার স্মৃতিচিহ্ন।' তারপর দৌড়ে ফিরে এসেছিল বাড়িতে, ঘুমিয়ে পড়েছিল। তবে ঘুমোতে যাবার আগে জানলার পাল্লাগুলো বন্ধ করতে বা টেবিলের ওপর আলো জ্বালিয়ে রাখতে সে ভোলেনি।

দশমিনিটের মধ্যেই গোটা পাড়ার লোকজন কানকাটার গুজবে মেতে উঠে হইহল্লাসহ ঐ ব্যাপার নিয়ে তর্কে-আলোচনায় মেতে উঠেছিল।

পরদিন আমি বাড়ির সামনে এসেও বিন্দুবিসর্গ জানতাম না কী ঘটেছে। আর তখনই বাওলার টুপি, পরিহিত ভদ্রলোকটি কঠোর স্বরে আমাকে বললেন-

'আপনি আপনার বন্ধুর এ কী অবস্থা করেছেন?' আমি বললাম, 'আমি কিছুই জানি না।' তিনি বললেন, 'ও হ্যাঁ, তা তো বটেই! আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে সে মারা গেছে।'

আমি চাই না কারো জীবনে ঐরকম মুহূর্ত আসুক। বুকের ধড়ফড়ানি কমাতে এবং ঠিকমত চিন্তা করার অবস্থায় পৌছতে আমার বেশ কিছু সময় লেগেছিল। নিজের ক্রোধ, ঘৃণা, দুঃখ এবং সমবেত লোকজনের আমার প্রতি শ্লেষাত্মক দৃষ্টিপাতে আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম, দমবন্ধ হয়ে আসছিল আমার। আমি তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বললাম, 'ঠিক আছে, চলুন, আগে ওপরে যাই। ওখানেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।' বিছানায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে মৃতবৎ পড়েছিল ভিনসেন্ট। আমি আলতোভাবে হাত দিলাম ভিনসেন্টের গায়ে আর তৎক্ষণাৎ বুঝলাম জীবনের স্পন্দন। ঐ স্পর্শ, ঐ উষ্ণতা আমাকে মুহূর্তে হারানো শক্তি ফিরিয়ে দিল।

প্রায় ফিসফিস করে আমি পুলিশকর্তাকে বলেছিলাম: 'স্যার ওকে জাগান। আর ও যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে তবে ওকে বলবেন আমি পারি ফিরে গেছি। এ অবস্থায় আমার উপস্থিতি ওর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।' আমাকে স্বীকার করতেই হবে ঐ কথার পর পুলিশ কমিশনার যুক্তিপূর্ণ আচরণ করতে লাগলেন এবং বুদ্ধি করে একটা গাড়ি ও একজন চিকিৎসক ডাকতে লোক পাঠালেন।

ঘুম ভাঙতেই ভিনসেন্ট খোঁজ করেছিল তার বন্ধুর, তার পাইপ ও তামাকের এমনকী নিচের ঘর থেকে টাকার বাক্সটা ওপরে আনার কথাও ভাবছিল। দ্বিধাহীনভাবে এক রহস্যময়তা অনুভব করলেও তা আমায় স্পর্শ করেনি বরং তা আমাকে সমস্ত যন্ত্রণার বিরুদ্ধে শক্তি যুগিয়েছিল।

তারপর ভিনসেন্টকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আর সেখানে গিয়েই আবার ভিনসেন্টের মস্তিষ্ক নড়াচড়া শুরু করে।

এর পরের ঘটনা সবারই জানা এবং তা এখানে উল্লেখ্যযোগ্যও হত না যদি না জানতাম চূড়ান্ত যন্ত্রণা ও বিপন্নতার মধ্যেও উন্মাদাগারে চিকিৎসাধীন একজন মানুষ মাসখানেক অন্তর ফিরে পেত তার যুক্তিবোধ যা তাকে বুঝিয়ে দিত তার করুণ অবস্থার কথা আর সুতীব্র ঝোড়ো আবেগ নিয়ে আঁকত অসামান্য সব ছবি যা এখন সর্বজনপরিচিত।

তার শেষ চিঠি আমি পেয়েছিলাম পোঁতোয়াজ-এর কাছের ওভর থেকে।

সে বলেছিল সে আশা করছে বেশ কিছুটা সুস্থ সে হয়ে উঠবে আর তখন ব্রিটানিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। যদিও তখনই সে স্বীকার করেছিল তার রোগমুক্তির অনিবার্য অসম্ভবতা।

'ডিয়ার মাস্টার (এই কথা এই একবারই সে ব্যবহার করেছিল), আপনাকে জানার পর, আপনাকে এত কষ্ট দেবার পর এখন মনে হচ্ছে বিকৃত মানসিক অবস্থা নিয়ে নয়, মরা উচিত সুন্দর সুস্থ স্বাভাবিক মন নিয়েই।' এবং যখন নিজের হাতে পেটে পিস্তল চেপে গুলি চালিয়ে বিছানায় শুয়ে পাইপ টানতে টানতে সে চিরশান্ত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল, ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছিল, তখন তার মন সত্যিই সুস্থ ও স্বাভাবিক, তার হৃদয়ে তখন কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়, তার নিজের সৃষ্টির প্রতি ছিল অপরিসীম ভালবাসা, মমত্ববোধ।

লে মঁস্ত্র-এ জঁ দেলঁ লেখেন: 'যখন গগ্যাঁ উচ্চারণ করেন 'ভিনসেন্ট' এই নাম তখন তার কণ্ঠস্বরে থাকে স্নেহার্দ্র নম্রতা।'

এর কারণটা না জেনেই কেবল ধারণার বশবর্তী হয়ে জঁ দেলঁ যা বলেন তা কিন্তু সত্য।

কেন তা আমি জানি। □

লেখাটি 'Paul Gauguin' (Edited by Marla Prather and Charles F. Stuckey) বই থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত। বইটির প্রকাশক: KONEMANN (1994), এই লেখাটি 'AVANT ET APRES', পল গগ্যাঁ লেখেন ১৯০৩ সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে। ঐ বছরই ৮ই মে পল গগ্যাঁ মৃত্যুবরণ করেন। ভ্যান গঘ মৃত্যুবরণ করেন ভাই থিও-র বুকে ২৯শে জুলাই ১৮৯০-এ আর তার ছ'মাসের মধ্যে থিওর মৃত্যু ২৫শে জানুয়ারি ১৮৯১ সালে।

পল গগ্যাঁ ভ্যান গঘের সঙ্গে থাকতে আর্ল-এ আসেন ২৩শে অক্টোবর ১৮৮৮। পারি ফিরে যান ঐ দুর্ঘটনার (২৩শে ডিসেম্বর ১৯৮৮) পরদিন।

১. Emile Bernard (1868-1941) প্রকাশিত ভ্যান গঘের নির্বাচিত চিঠির সংকলন Mercure de France (১৮৯৩)

২. এটি একটি ননসেন্স ফ্রেজ, লেখক Alphonce Daudet (১৮৪০-১৮৯৭)

৩. সম্পাদকদ্বয়ের ইংরেজী অনুবাদ: I am the Holy Spirit.
I am of sound mind !

৪. ঠিক কোন্ ছবিটির কথা গগ্যাঁ বলেছেন আমি নিশ্চিত নয় তবে ভ্যান গঘের ১৮৮৮-তে আঁকা The Poet-এ ক্রোমইয়েলোর বাহুল্য থাকলেও ব্যাকগ্রাউণ্ড রাতের নক্ষত্র-আলোকিত গাঢ় নীল এবং নক্ষত্র যুক্ত।

৫. এখানে গগ্যাঁ যা বলছেন এই মহিলা সম্পর্কে তা সঠিক না হতেও পারে। Nathaniel Harris লিখিত The Art of Van Gogh (Optimum Books. ১৯৮২) এ বিষয়ে বলা হচ্ছে: এই মহিলার নাম গ্যাবি এবং সে শহরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি গণিকালয়ের গণিকা। এবং ভ্যান গঘ ঐ স্থানে গিয়ে নিজের হাতেই মহিলাকে ঐ 'উপহার' দেন এবং ওটিকে 'যত্ন করতে বলেন।'

এই লেখায় বর্ণিত সব ঘটনাকে, যেমন গগ্যাঁর দ্বারা ভ্যান গঘের প্রভাবিত হওয়া, গুরু মানা বা গগ্যাঁর পিতৃস্নেহময় ব্যবহার ইত্যাদির সত্যতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। আমি এই দুজন শিল্পীকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। এই লেখাটি বেছে নিয়ে আমি কাউকে আহত করতে চাইনি। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঐ সময় ও দুজন নক্ষত্রসদৃশ স্রষ্টার একসাথে কাজ করার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটিকে 'first hand account' হিসাবে রাখতে চেয়েছি। এ ব্যাপারে আরো তথ্যসমৃদ্ধ কোন লেখার সন্ধান পেলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। ফ্রেঞ্চ শব্দগুলির অনুবাদে সাহায্য করেছেন বন্ধু শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়।

রূপান্তর: শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

রলাঁ বার্থ

রচয়িতার মৃত্যু

সারাসিন গল্পে নারীবেশধারী এক খোজার পরিচয় দিতে গিয়ে বালজাক লিখছেন : 'তার আকস্মিক ভীতি, তার অযৌক্তিক খামখেয়াল, তার সহজাত উদ্বেগ, তার দুর্বিনীত স্পর্ধা, তার অকারণ ব্যস্ততা, আর তার সংবেদনশীলতা—এই নিয়েই মহিলাটি।' কে বলছে এভাবে? সেই নারীর পেছনে লুকিয়ে থাকা খোজা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে বদ্ধপরিকর নায়ক? নাকি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নারীবিষয়ক একটি দর্শন লাভকারী ব্যক্তি-বালজাক? অথবা নারীত্ব সম্পর্কে 'সাহিত্যিক' ধারণা প্রদানকারী লেখক-বালজাক? নাকি সর্বজনীন প্রজ্ঞা? রোমান্টিক এক মনস্তত্ত্ব? কথনোই জানতে পারবো না আমরা। পারবো না তার বিশেষ কারণ হচ্ছে, লেখার অর্থই হলো প্রতিটি কণ্ঠস্বর, প্রতিটি উৎসবিন্দুর বিনাশ। লেখা সেই নিরপেক্ষ, যৌগিক, তির্যক স্থান, যা থেকে আমাদের বিষয় পিছলে সরে যায়—যিনি লিখছেন তার পরিচয় থেকে শুরু করে অন্য সব পরিচয় যেখানে লুপ্ত হয়ে যায় সেই নেতি-ই হচ্ছে লেখা।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ব্যাপারটি এভাবেই ঘটে আসছে। বাস্তবের সঙ্গে সরাসরি ক্রিয়া করার লক্ষে নয়, বরং অকর্মকভাবে, অর্থাৎ প্রতীক ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য যে-কোনো উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত অবস্থায় যখনই কোনো একটি প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয়, তখনই ঘটে এই সংযোগবিচ্ছিন্নতা, কণ্ঠস্বরটি হারিয়ে ফেলে তার উৎস, রচয়িতা এগিয়ে যান তার মৃত্যুর দিকে, শুরু হয় লেখা। অবশ্য এই রীতিসম্পর্কিত ধারণার রকমফের ঘটেছে, আদিবাসী সমাজে একটি আখ্যানের দায়-দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করেন না। বরং একজন মাধ্যম, শামান কিংবা কোনো কথকের ওপর সে-দায়ভার বর্তায়। আর এই কথকের 'উপস্থাপনা' অর্থাৎ বর্ণনাপদ্ধতির দক্ষতা কখনো কখনো প্রশংসিত হতে পারে,

কিন্তু কথনোই তার 'প্রতিভা' নয়। রচয়িতা এক আধুনিক ব্যক্তিত্ব। আমাদের সমাজেরই সৃষ্টি। আর সেটা এটুকুই যে, মধ্যযুগীয় ইংলিশ অভিজ্ঞতাবাদ, ফরাসী যুক্তিবাদ এবং রিফর্মেশনের ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়ে এ সমাজ সমর্থ হয়েছে ব্যক্তির, আরো ভালো করে বলতে গেলে, 'মানবসত্তা'র মর্যাদাকে আবিষ্কার করতে। সুতরাং সাহিত্যে এই দৃষ্টবাদ-ই যে হবে ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্তসার এবং সর্বোচ্চসীমা সেটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। আর, এই ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারাই রচয়িতার সত্তার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। রচয়িতা এখনও সাহিত্যের ইতিহাস, লেখকদের জীবনী, সাক্ষাৎকার, সাময়িকী এসবের মধ্যে বিরাজ করেন। যেমনটি করেন সেইসব পণ্ডিতদের বিশেষ সচেতনতার মধ্যে, যারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও কাজকে রোজনামচা আর স্মৃতিকথায় গ্রথিত করতে ব্যগ্র। গড়পড়তা সংস্কৃতিতে সাহিত্যের যে-প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় সেটি জোরজবরদস্তিমূলকভাবে লেখক, তার সত্তা, তার জীবন, তার রুচি আর তার প্যাশনকেন্দ্রিক—যেখানে সমালোচনা বলতে এখনও মুখ্যত শুধু এটুকুই যে, বোদলেয়ারের সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তি-বোদলেয়ারের ব্যর্থতা, ভ্যান গঘের ক্ষেত্রে তার উন্মাদগ্রস্ততা, চাইকভ্স্কির বেলায় তার চরিত্রহীনতা। যে পুরুষ বা নারী কথাসাহিত্যের কম-বেশি স্বচ্ছ রূপক, ব্যক্তির কণ্ঠস্বর এবং আমাদের প্রতি আস্থাস্থাপনকারী রচয়িতার মাধ্যমে কোনো একটি কাজ সৃষ্টি করেছেন সেই পুরুষ বা নারীর মধ্যেই কাজটির ব্যাখ্যা খোঁজা হয়ে থাকে সবসময়, যেন সেটাই শেষ কথা।

যদিও রচয়িতার প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ রয়ে গেছে জোরালোই (আর নব্য সমালোচনা[১] তো এই নিয়ন্ত্রণ সংহত করার বাইরে আর কিছুই করে নি), তারপরেও একথা সবাই জানেন, বিশেষ কিছু লেখক সেই নিয়ন্ত্রণের রাশ আলগা করার চেষ্টা করেছেন। তখন পর্যন্ত ভাষার স্বত্বাধিকারী বলে যাকে ভাবা হতো সেই ব্যক্তির স্থানে ভাষাকে পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত করার প্রয়োজন ফ্রান্সে নিঃসন্দেহে মালার্মেই প্রথম বুঝতে পারেন এবং দূরদৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করেন। মালার্মে, এবং আমরাও মনে করি, ভাষাই কথা বলে, রচয়িতা নন, আর লেখার অর্থ হচ্ছে, এক পূর্বপালনীয় নৈর্ব্যক্তিকতার (এর সঙ্গে বাস্তববাদী উপন্যাসিকদের নিবীর্যকারী বস্তুনিষ্ঠাকে কোনোক্রমেই গুলিয়ে ফেললে চলবে না) মাধ্যমে এমন একটি বিন্দুতে পৌছানো, যেখানে শুধু 'ভাষা'-ই কাজ করে, 'পারফর্ম' করে, 'আমি' নয়। লেখার স্বার্থে (যার অর্থ, দেখা যাবে, পাঠকের

স্থান পুনরুদ্ধার) রচয়িতাকে দমিয়ে রাখার মধ্যেই মালার্মের সমস্ত কাব্যতত্ত্ব নিহিত ছিলো। অহংভারাক্রান্ত ভ্যালেরি যদিও মালার্মের তত্ত্বকে যথেষ্ট গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করেছেন, কিন্তু ধ্রুপদবাদের প্রতি তার আকর্ষণহেতু অলংকারশাস্ত্রে পাঠগ্রহণকারী ভ্যালেরি কথনোই রচয়িতার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ এবং তাকে উপহাস করা থেকে বিরত হন নি, ভাষাতত্ত্ব এবং অনেকটা যেন নিজের ক্রিয়াকলাপের 'অনিশ্চিত' প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। ভ্যালেরি তার সমগ্র গদ্যরচনায় অপরিহার্যভাবে সাহিত্যের বাচনিক অবস্থার পক্ষে বিদ্রোহ প্রদর্শন করা সত্ত্বেও রচয়িতার অন্তর্বর্তীতার সাহায্যগ্রহণকে নির্ভেজাল কুসংস্কার বলে মনে করেছেন। প্রুস্ত নিজে, দৃশ্যতই যাকে বলা যায় তার বিশ্লেষণের আপাত-মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, এক অসাধারণ কৌশলে লেখক আর তার চরিত্রগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক অনিবার্যভাবে দুর্বোধ্য করে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন, যিনি দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন তাকে তো নয়ই, এমনকি যিনি লিখছেন তাকেও বর্ণনাকারী না-বানিয়ে যিনি লিখতে যাচ্ছেন (উপন্যাসের এই যুবক—কিন্তু কথা হলো, তার বয়সই বা কতো আর কে-ই বা সে ?—লিখতে চায় কিন্তু পারে না, শেষ পর্যন্ত যখন লেখা সম্ভব হয় তখনই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে) দায়িত্বটি তাকে দিয়ে প্রুস্ত আধুনিক লেখাকে এর মহাকাব্য দান করেছেন। চরম বৈপরীত্যের সঙ্গে, উপন্যাসে তার জীবনকে ব্যবহার না-করে অর্থাৎ গতানুগতিক পথটি বর্জন করে, তিনি তার জীবনকেই একটি কাজে পরিণত করলেন, আর তা করতে গিয়ে নিজের গ্রন্থটিকে গ্রহণ করলেন নমুনা হিসেবে ; কাজেই, আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট—শালু মঁতেস্কুকে অনুকরণ করে না, উল্টো মঁতেস্কুই তার সম্পর্কিত গল্প-কাহিনী ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিক দিয়ে—শালু[২] থেকে উদ্ভূত এক গৌণ ভগ্নাংশ ছাড়া কিছু নয়। এই আধুনিকতার প্রাক-ইতিহাস পর্যন্তই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে সবশেষে আমরা পরাবাস্তববাদ-এর দিকে নজর দেবো, যা ভাষাকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদানে ব্যর্থ হলেও (কারণ, ভাষা একটি পদ্ধতি, এবং মুভমেণ্ট বা বিচলনের লক্ষ্য, রোমান্টিকভাবে, নিয়মাবলীর প্রত্যক্ষ বিনাশ—যা নিজেই আরো অলীক, কারণ, একটি নিয়ম বা রীতি ধ্বংস হতে পারে না, 'সেটাকে থামিয়ে দেয়া' যেতে পারে বড়জোর) অর্থের প্রত্যাশার ক্ষেত্রে আকস্মিক আশাভঙ্গের পক্ষে অবিরাম যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে (যা পরাবাস্তবাদী 'ঝাঁকি' নামে বিখ্যাত), বিশ্বাসভরে হাতকে এই দায়িত্ব অর্পণ করে যে, মস্তিষ্কের

অজান্তেই তাকে যতো দ্রুত সম্ভব লিখে যেতে হবে (যার অর্থ দাঁড়ায় স্বতোলিখন) এবং এক সূত্রে লিখছেন এমন কিছু লোকের মতামত আর নীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে, রচয়িতার প্রতিচ্ছবি বিনষ্টকরণে বিশেষ অবদান রেখেছে। খোদ সাহিত্যকে একপাশে সরিয়ে রেখে (এ-ধরনের পৃথকীকরণ প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন হয়ে পড়ছে), ভাষাতত্ত্ব ইদানিং প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণাত্মক উপকরণের সাহায্যে রচয়িতার বিনাশ ঘটিয়েছে : ভাষাতত্ত্ব দেখিয়েছে, উচ্চারণের গোটা ব্যাপারটিই একটি শূন্যগর্ভ প্রক্রিয়া, কারণ, কথোপকথনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিত্বের সাহায্যে সেই শূন্যতা পূরণ না-হলেও প্রক্রিয়াটি নিখুঁতভাবে তার কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে রচয়িতা তাৎক্ষণিক লেখার বাইরে আর কিছুই নন, যেমনটি, তাৎক্ষণিকভাবে আমি কথাটা উচ্চারণের বাইরে আমি কিছুই নয় : ভাষা কোনো 'ব্যক্তি'কে চেনে না, চেনে একটি 'বিষয়', আর যে-বিশেষ উচ্চারণের কারণে সেটি সংজ্ঞায়িত হয় তার বাইরে গিয়ে শূন্যগর্ভ হয়ে পড়া এই বিষয়-ই ভাষাকে 'ধরে রাখার জন্যে যথেষ্ট : যথেষ্ট, এক অর্থে, ভাষাকে নিঃশেষিত করতে।

রচয়িতার এই অপসারণ (এক্ষেত্রে কেউ ইচ্ছে করলে ব্রেখটের সঙ্গে 'ডিস্টান্সিং' বা সাহিত্যমঞ্চের দূরকোণে ক্রমেই বিলীন হতে থাকা একটি প্রস্তরমূর্তির মতো রচয়িতার প্রসঙ্গে আলাপ করতে পারেন) কেবলই একটি ঐতিহাসিক সত্য কিংবা লেখার কাজ নয়, এটা আধুনিক টেক্সট্-এর আমূল রূপান্তর ঘটায় (কিংবা এর পর থেকে একটি টেক্সট্ এমনভাবে রচিত এবং পঠিত হয় যাতে করে, এর প্রতিটি স্তরে রচয়িতা থাকেন অনুপস্থিত—যা ঐ একই জিনিস)। কালিকতাটি ভিন্ন। রচয়িতাকে, যখন তিনি বিশ্বাসভাজন, সবসময়ই তার গ্রন্থের অতীত হিসেবে গণ্য করা হয়: গ্রন্থ এবং রচয়িতা একটি পূর্ব আর একটি পর দ্বারা বিভক্ত রেখার ওপর আপনা-আপনি-ই দাঁড়িয়ে থাকেন। ধারণা করা হয়ে থাকে, রচয়িতা তার গ্রন্থের পুষ্টিবিধান করেন, অর্থাৎ তিনি গ্রন্থটির আগেই অস্তিত্বশীল থাকেন, চিন্তা করেন, যন্ত্রণা ভোগ করেন, গ্রন্থটির জন্যেই বাঁচেন, পূর্ববর্তীতার দিক দিয়ে পিতা এবং সন্তানের মধ্যে যে সম্পর্ক, রচয়িতা এবং তার সাহিত্যকর্ম ঠিক সেই একই সম্পর্কে সম্পর্কিত। এরই সম্পূর্ণ বিপরীতে, আধুনিক লিপিকার জন্মগ্রহণ করেন তার টেক্সট্-এর সঙ্গেই, তার লেখার পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোনো সত্তা তারনেই। তিনি উদ্দেশ্য এবং তার গ্রন্থ বিধেয়—ব্যাপারটি তাও নয়, উচ্চারণের মুহূর্তটুকু

ছাড়া আর কোনো সময়ের অস্তিত্ব নেই এবং প্রতিটি গ্রন্থই চিরন্তনভাবে এখানে এবং এক্ষুণি লেখা হয়ে থাকে। আসল কথা হচ্ছে (কিংবা, এ-থেকে এটাই বেরিয়ে আসে) লেখা এখন আর রেকর্ডিং, স্বরলিপি, প্রতিনিধিত্ব, এবং (ক্লাসিকদের ভাষায়) 'চিত্রিত' করার কাজটি সম্পাদন করতে পারে না, বরং লেখা যা করে তাকে ভাষাতাত্ত্বিকদের ভাষায়, অক্সফোর্ড দর্শন অনুযায়ী, বলা হয়ে থাকে, এক পারফর্মেটিভ—(একান্তভাবেই উত্তম পুরুষে এবং বর্তমান কাল ব্যবহার করে রচিত) একটি বিরল বাচনিক রূপ যেখানে, যা বলা হলো সে-অনুযায়ী কাজ করা ছাড়া উচ্চারণের অন্য কোনো বিষয় (অন্য কোনো প্রস্তাবনা) নেই—ব্যাপারটা অনেকটা আমি রাজাদের কথা ঘোষণা করছি বা আমি সুপ্রাচীন কবিদের কথা বলছি—এই ধরনের। সেজন্যই, আধুনিক লিপিকার রচয়িতাকে সমাধিস্থ করার পর তার পূর্বপুরুষদের করুণা-উদ্রেককারী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একথা আর কথনোই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, এই হাত তার চিন্তা অথবা প্যাশনের তুলনায় অত্যধিক শ্লথ, আর সে-কারণে প্রয়োজনীয়তার একটি সূত্র তৈরি করে তাকে এই বিলম্বের ওপর জোর দিতে হবে আর তার প্রকরণকে 'মার্জিত' করে যেতে হবে অনির্দিষ্টকাল ধরে। উল্টো, তার হয়ে, সমস্ত কণ্ঠস্বর থেকে বিচ্ছিন্ন তার হাত ক্ষোদিত লিপির (তবে অভিব্যক্তির নয়) নির্ভেজাল ঢঙে এমন একটি ক্ষেত্র খুঁজে বের করে যার কোনো উৎস নেই বা অন্তত, যার খোদ ভাষা ছাড়া অন্য কোনো উৎস নেই; এমনই এক ভাষা যা সমস্ত উৎসের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে নিরন্তর।

আমরা জানি, টেক্সট্ কোনো শব্দসারি নয়, যা একটি 'ঈশ্বরতত্ত্বগত' অর্থ (রচয়িতা-ঈশ্বরের 'বার্তা') প্রদান করে, বরং এটি এমন এক বহুমাত্রিক ক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন ধরনের লেখা, যার কোনোটিই মৌলিক নয়, মিশ্রিত হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। টেক্সট্ হচ্ছে সংস্কৃতির অগুনতি কেন্দ্র থেকে নেয়া উদ্ধৃতির এক সূক্ষ্ম বস্ত্র। সেই দুই চিরন্তন অনুকরণকারী বুভার এবং পিকুচেঁ-র মতো—যারা একই সঙ্গে মহিমান্বিত ও কৌতুকময় এবং যাদের প্রচণ্ড হাস্যস্পদতাই লেখার সত্য-র দিকে তর্জনী নির্দেশ করে—লেখকের একমাত্র কাজ হচ্ছে পূর্ববর্তী তবে কথনোই মৌলিক নয় এমন একটি ভঙ্গির অনুকরণ করা। লেখকের একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে লেখার সঙ্গে লেখা মিশ্রিত করার, একটিকে দিয়ে আরেকটির পাল্টা জবাব দেয়ার, এমনভাবে, যাতে করে এগুলোর কোনোটির ওপরেই তাকে কথনো

নির্ভরশীল হয়ে পড়তে না হয়। নিজেকে প্রকাশ করতে চাইলে তাকে অন্তত এটুকু জানতে হবে, অভ্যন্তরীণ যে-'বিষয়'টি তিনি 'অনুবাদ' করতে ইচ্ছুক সেটা নিজেই ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে থাকা একটি অভিধানমাত্র, এতে যে-সমস্ত শব্দ রয়েছে সেগুলোকে অন্যান্য শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যাই করা যায় কেবল এবং সেটা অন্তহীনভাবে। লক্ষণীয়ভাবে অনেকটা এ-ধরনের অভিজ্ঞতারই সম্মুখীন হয়েছিলেন যুবক টমাস ডি কুইন্সি[৪], যিনি গ্রীক ভাষায় এতোটাই দক্ষ ছিলেন যে সেই মৃত ভাষায় আধুনিক ধ্যান-ধারণা এবং ইমেজ প্রকাশ করার জন্যে তিনি বোদলেয়ারের (প্যারাডিস আর্টিফিসিএলস গ্রন্থের) ভাষ্য অনুযায়ী, 'নিজের জন্যে এক অব্যর্থ অভিধান তৈরি করেন, যে-অভিধান নিশ্চাদ সাহিত্যিক বিষয়-বস্তুর গতানুগতিক সহিষ্ণুতার ফসলের চাইতে আরো অনেক বিশাল এবং জটিল।' রচয়িতাকে ছাড়িয়ে যাবার পর লিপিকারের ভেতর আর প্যাশন, হিউমার, অনুভূতি, বা প্রভাব বলে কিছু থাকে না, থাকে শুধু বিশাল এক অভিধান যেখান থেকে তিনি অবিরাম লিখে যেতে পারেন: গ্রন্থটির অনুকরণ ছাড়া জীবন আর কিছুই করে না, আর খোদ গ্রন্থটি হচ্ছে চিহ্নের তৈরি একটি সূক্ষ্মবস্ত্র—হারিয়ে যাওয়া, অনন্তকালের জন্যে মূলতবি রাখা এক অনুকরণ।

রচয়িতা একবার অপসারিত হবার পর টেক্সট্-এর পাঠোদ্ধারের দাবিটি অর্থহীন হয়ে পড়ে একেবারে। কোনো টেক্সট্-এ একজন রচয়িতা আরোপ করার অর্থই হচ্ছে টেক্সটটিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা, এর চূড়ান্ত নির্দেশ করা, লেখার পরিসমাপ্তি ঘটানো। এমন একটি ধারণা সমালোচনার ক্ষেত্রে চমৎকার মানিয়ে যায়, সমালোচনা তখন কাজটির নেপথ্যে অবস্থিত রচয়িতাকে (অথবা সমালোচনার মূল উপাদান—সমাজ, ইতিহাস, আত্মা, স্বাধীনতা) আবিষ্কার করার গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, রচয়িতাকে যখন পাওয়া গেলো, 'ব্যাখ্যায়িত' হলো টেক্সটটি—জয় হলো সমালোচকের। সুতরাং এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, ইতিহাসগত দিক দিয়ে, রচয়িতার রাজত্ব সমালোচকেরও রাজত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে, আবার এ-ব্যাপারেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সমালোচনা (হোক তা নব্য) আজকাল রচয়িতার মতোই গুরুত্বহীন। লেখার বহুত্বের ভেতর থেকে সবকিছুর জট ছাড়াতে হবে, কোনোকিছুরই পাঠোদ্ধার করা যাবে না, কাঠামোটিকে অনুসরণ করা যেতে পারে, প্রতিটি বিন্দুতে, প্রতিটি স্তরে সেটাকে 'প্রসারিত' করা যেতে পারে (মোজার সুতোর মতো), কিন্তু তার নিচে কিছুই নেই: লেখার ক্ষেত্রটির চারপাশে আবর্তন করা যেতে পারে,

কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করা যাবে না, অর্থকে একটি নিয়মানুগ অব্যাহতি দানের মাধ্যমে লেখা অবিরামভাবে অর্থ জমা করে সে-অর্থকে প্রতিনিয়ত হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়ার জন্যেই। ঠিক এভাবেই সাহিত্য (এখন থেকে একে লেখা বলাই ভালো) টেক্সটকে (এবং বিশ্বরূপ টেক্সটকে) একটি 'গোপন সূত্র', একটি চূড়ান্ত অর্থ, প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে এমন এক তৎপরতাকে মুক্ত করে দেয়, যাকে বলা যায় ঈশ্বরতত্ত্ববিরোধী, যে-তৎপরতা পুরোপুরি বৈপ্লবিক, কারণ, অর্থ আরোপে অস্বীকৃতি জানানোর মানেই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে এবং তার মূল উপাদান—যুক্তি, বিজ্ঞান ও আইনকে অস্বীকার করা।

বালজাকের বাক্যটিতে ফিরে আসা যাক। কেউ-ই, কোনো 'ব্যক্তি'ই বলছে না কথাগুলো: এর উৎস, এর কণ্ঠস্বর লেখাটির সত্যিকার স্থান নয়, স্থানটি হচ্ছে পঠন। অত্যন্ত যথাযথ আরেকটি উদাহরণ ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে তুলতে সহায়তা করবে: সাম্প্রতিক গবেষণা (জে. পি. ভারন্যান্ট)[৫] গ্রীক ট্র্যাজেডির গঠনগত দুর্বোধ্য প্রকৃতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়েছে যে, ট্র্যাজেডির টেক্সটগুলো দ্ব্যর্থক শব্দ দিয়ে তৈরি আর প্রতিটি চরিত্র তার নিজের মতো করে সেগুলোর অর্থ বুঝে নেয় (এবং এই চিরন্তন ভুলবোঝাবুঝিটিই হচ্ছে মূলত 'ট্র্যাজিক'); তবে একজন রয়েছেন, যার কাছে প্রতিটি শব্দের দ্ব্যর্থকতাই ধরা পড়ে এবং তিনি, সেই সঙ্গে, তার সামনে কথা বলে যাওয়া চরিত্রগুলোর এই বিশেষ বধিরতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারেন—এই একজনটি হচ্ছেন পাঠক (বা, এখানে শ্রোতা)। এভাবেই লেখার সামগ্রিক অস্তিত্ব উন্মোচিত হয়: অসংখ্য লেখার সাহায্যে তৈরি হয় একটি টেক্সট এবং লেখাগুলোকে টেনে আনা হয় বহুবিধ সংস্কৃতি থেকে, আর এই লেখাগুলো সংলাপ, প্যারোডি এবং প্রতিযোগিতার পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতরে প্রবেশ করে, তবে একটি স্থান রয়েছে যেখানে ফোকাস করা হয় এই বহুত্বকে, আর সে-স্থানটি হচ্ছে পাঠক, এতোদিন যা বলা হতো সেই রচয়িতা নয়। পাঠকই হচ্ছে সেই স্থান যেখানে লেখাটি প্রস্তুতকারী সমস্ত উদ্ধৃতি খোদিত হয় সেগুলোর কোনোটিকে না-খুইয়েই, একটি টেক্সট-এর ঐক্য এর উৎসে নয়, গন্তব্যে। তা-সত্ত্বেও এই গন্তব্য কোনোক্রমেই আর ব্যক্তিগত থাকতে পারে না: পাঠক ইতিহাস, জীবনী কিংবা মনস্তত্ত্ববিহীন, তিনি স্রেফ সেই কোনো একজন যিনি লিখিত টেক্সট যে-সমস্ত সূত্রের সাহায্যে গঠিত, তা একটিমাত্র ক্ষেত্রে ধরে রাখেন। সে-কারণেই, পাঠকের অধিকারের ওপর প্রতারণাপূর্ণভাবে, প্রভুত্বপ্রদর্শনকারী

এক মানবতাবাদের নামে নব্যলেখার নিন্দা করা নিতান্তই উপহাসযোগ্য। ধ্রুপদী সমালোচনা কখনোই পাঠকের দিকে নজর দেয়নি, এই সমালোচনার দৃষ্টিতে রচয়িতাই সাহিত্যের একমাত্র ব্যক্তি। সুবোধ সমাজ যে-বিশেষ জিনিসটি সরিয়ে রাখে, উপেক্ষা করে, লুকিয়ে রাখে, কিংবা ধ্বংস করে ফেলে সেটার স্বার্থে আমরা আর তার উদ্ধত অ্যান্টিফ্র্যাসটিকাল[৬] পাল্টা অভিযোগকে আমাদের বোকা বানাতে দিচ্ছি না। আমরা জানি, লেখার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্যে পুরাণের বিনাশসাধন প্রয়োজন: রচয়িতার মৃত্যুর মূল্যেই হতে হবে পাঠকের জন্ম।

---

১. বার্থ এখানে ৩০, ৪০ অথবা ৫০-এর দশকের ইঙ্গ-মার্কিন নব্য সমালোচনার কথা বলছেন না, বলছেন ৬০-এর দশকের ফরাসী "নভেল ক্রিতিক" (novelle critique)—এর কথা।

২. ব্যারন দি শালু মার্শাল প্রুস্ত-এর 'এ লা রেশারশে দু তেমপ্স পারদু' (১৯১৩-২৭)-এর একটি চরিত্র। ধারণা করা হয় লেখকের বন্ধু কাউন্ট রবার্ট দি মঁতেস্কু-র আদলে চরিত্রটি আঁকা হয়েছে।

৩. এরা গুস্তাভ ফ্লবেয়ার-এর উপন্যাস বুভার এবং পিকুচে-র দুই প্রধান চরিত্র। বুর্জোয়া মূঢ়তার ওপর ভিত্তি করে রচিত উপন্যাসটি লেখকের মৃত্যুর পর ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. টমাস ডি কুইন্সি (১৭৮৫-১৮৫৯), ইংরেজ প্রবন্ধকার, কনফেশনস অভ অ্যান ইংলিশ অপিয়াম ইটার গ্রন্থের রচয়িতা।

৫. দেখুন, জঁ পিয়েরে ভারন্যান্ট এবং পিয়ের ভিদাল-নাকোয়ে-র Mythe et tragedie en Grece ancienne, প্যারিস ১৯৭২; বিশেষ করে, পৃষ্ঠা ১৯-৪০, ৯৯-১৩১ ইংরেজি অনুবাদক।

৬. অ্যান্টিফ্র্যাসিস বলতে, অলঙ্কারশাস্ত্রে, একটি শব্দকে তার প্রচলিত অর্থের বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা বোঝায়।

জিওফ বেনিংটনের ইংরেজি অনুবাদ থেকে

রূপান্তর: জি এইচ হাবীব

শুভঙ্কর দাশ

এবার তাহলে গতি হোক হে ঈশ্বরের ধোয়াতুলসিপাতা এক কামড় পেনের নজর পেড়ে ফেলছে তাকে

এরম একটা জন্মদিন গ্যাছে ভেবে এই শুরু অথচ শুরুটাই হল না কখনো এই সঠিকতা খোঁজে কে কবে পেয়েছে সেই সোনার কুসুম ক্লেদ তার রক্তের ভার শুষে নেয়। এরপর গাঁটে গাঁটে রজতজয়ন্তি চলে এলো, পালিত হচ্ছে রাস্তারা। দরজাটা একটা চোখ। যে আসনে রাখাছিলো মৃত্যুর ধুলো নিরুপায় বিজ্ঞাপন হাজার হাজার। অবশেষে ঝি-কাটিং মাগী দেখেও কি বীর্যপাত হবে। অথবা হাত মারার পরও কিস্যু বেরোচ্ছে না এই বোধ রাত্রি যাপনের মাত্রা কোথায় রেখেছি। নিজস্ব এখন কোণ। একটা পোকার অন্ধকার কোনো মাড়হীন নরম প্লেন খানিকটা চাদরের মতো এই রোদ এই জন্মদিনের ফ্যাকাসে গোলাপ আর কাঁটা।

খুব একটা কুড়েমির আড়মোড়া টান টান। ভেতরে পাকাচ্ছে দোষ।
উড়ে যাওয়া দেখে রক্তের চিন্তা বলে কার হবো। কার দানা হয়ে ঝরে,
ঝরে পড়ে সময়ের গতর সন্ধ্যা।

এখন কেমন করে আছো নিজস্বতার পুরোনো দেওয়ালে
হেঁটে ফুটপাথ তাকে ডাকে এ্যাতদিন পর তবু জড়তা এলো নাকি
কুঁকড়ে যেতে গিয়ে কেন ফুটপাথ এরকম ভাবতে ভাবতে
বহু মানুষ আর বাস আর গরমের চলে যাওয়া গলার সেই পাথর মন্ত্র আর ভূতের ওঠবোস। গতরাতের সেই আলোর শরীরের আসতে আসতে হেঁটে যাওয়া মনে করা যাক। এসব কিছুর খুব প্রতিক্রিয়া যেন খুব দরকার। জবাব আর শব্দ আর গা ঝাড়া সংশয়। তখন কে হারে। যেন জেতার কথা ছিলো অথচ এ্যাতটা ধ্যাষ্টামো এ্যাতটা লড়াই এ্যাতটা ঘাম এ্যাতটা মাথার

পিল পিল ছেড়ে এই ফ্যাঁসা তাকিয়ে তাকিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দৃষ্টি হারিয়ে জড়তার তিনকাল বৃষ্টি দাও আলো এবং অন্ধকার এবং বিচি দেখাবে না বলে সবজে পাতা রেখে ন্যাকড়াবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। ভালোবাসার ইতিহাস কি এই আধ ইঞ্চি রক্তের মড়মড়ে শেষ হবে। রক্তের মাড় জাবড়ে আছে নীলে। ফ্লুরোসেন্ট কাটা হাত সব পড়েছে জীবনের। জীবন সঙ্গিনী রাত তুমি কার থেকে ধার নেবে নিঃশ্বাসের ঘন অন্ধকার। ঠোঁটের জন্যে প্রেম রেখেছে কে স্নেহ হয় অকারণ জন্ম তার হবে না কখনো অথবা জন্মেরই বা কি দরকার।

গতরাতে আবার হ্ফোঁটা হৃদয়ের প্রেম উৎসে
লেগে আছে। এই বরাৎ তাকে কে দিলো
এ ঘনঘটা তৈরী হচ্ছে আবারও।
জলের কাঁটায় মানুষের প্রেম নাকি চমৎকার অশ্রু নিবেদন?

এরপর খানিকটা পাখনায় ঘুম পাচ্ছে

কাগজ বেঁধেছে তার সুধা ওগো অধিকার এই দেখ কে কবে
সেখানে ছিলো তার কপালের চামড়া টান করি আমি
জড়িয়ে রয়েছো কেন? কেন দেখে দেখে মাতৃবোধ
জাগেনিতো জাগেনি জন্ম কোনো সেই গান গেয়েছিলে মনে ছিলো
মনে না থাকিলে আর পাখী জন্ম একদিন তো ঘুঁচে যাবে
দেখে রাখো বড় হলে মাথা খেয়ে নাও ফের পরো আমারই ফুলে ঢাকা
এ যেন গৈরিক সূর্যোদয় ফেস্টুন কালার কালার
সেই মতো জন্ম রয়ে গেল কে গেলে যমুনায়
ভুলে গেলে শব্দ পরিচয় বহু কালি জমা হচ্ছে
শরীর তোর ওপর বাপ আদর করছি ফের চুলগুলো
তোকে বাপ আদর করছি এই শব্দগুলো এই সময়চুল্লি বাপ
আর চুলকোনি থেমে থেমে গেঁড়ে বসবে বলে দৌড়ে আসছে

চলে যাওয়া ছেড়ে তুমি ভেবেছিলে গঙ্গার স্রোত তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে
এমন সুন্দর ভোর কবে থেকে আসে আসতে পারে রঙিন রঙিন
সে বলেছিলো কবে যাবো পাখনায় কবে কেটে নেবো স্মৃতি জন্ম কোনো
উড়ে ওপরে ফের জোরে জোরে বৈঠা মারো
তেমন ধন্দে খোঁজে তাকে ঈশ্বরের স্বপ্নের সংসার
থামানো প্রেতে পাওয়া আঙুলের তীব্র আনচান থেকে যেতে পারে
এমন খোঁজ তাকে কে দিয়েছে জীবনের এমন স্বপ্ন কোনো
ঘুমের সময় ছাড়া কে দেবে আবারো
সেই ঘুরে ঘুরে ফের চমকে চলে যাওয়া সেভাবে উড়িছে ভারী শীত
তেমন অন্ধকার সাজগোজ মানা নাকি মৃত্যু অথবা এইসব টেনে নিতে পারা
কেমন করে ফের ভালো হবে কেমনে শুধোবে বিশ্বাসের খোঁজ
তাও অন্যায় কোনো কিভাবে ভেঙেছে
এইখানে শুরু হোক শীতের প্রহর
এইখানে মাড় রক্ত থেমে আছে চেরার মন্ত্র তাকে চমকে দিয়ে গেছে
এই অপরাধ সাধা ছিলো একটু রক্ত একটু স্রোত কোনো
গলে আসা মন্ত্রের ঘোর তাকে রেখেছে আড়ালে
এমন জনম সেইতো চেয়েছে এমন প্রহর তার কাজে লাগিবে কি
ওগো দিবানিশা ওগো শেষ এইখানে এইক্ষণে পুড়েছে চামড়ার টান
খুলে রাখি নির্ভয় স্বপ্ন অনেক হাজার তার চোখে ঝুলে আছে
থাকতে থাকতে এইবার কথা বলে ওঠো সেনোরিটা এবং একটা
মশাও খুঁজছে সেই ফাঁক রক্তের কাছে যাবে বলে

শঙ্করনাথ চক্রবর্তী

ফিনিক্সপাখীরওড়া

১.
একদিন প্রেম,
যাকে অভ্যর্থনাহেতু,
হারিয়েছি দ্রুততায়
অমর যৌবন

আজ দেখি অবসন্ন, গুল্মের শরীর,
একশৃঙ্গ কামুকের
শিশ্ন অভিজ্ঞান

২.
সেইসব রাত ছিল
তোর অন্তঃপুরে

আর এক তৈলসিক্ত
নির্দয় পাথর

এখন যা গুহাবাসী, বন্দরের পথে
ক্রমশ এগিয়ে যায়

তাঁত বন্ধ থাকে

৩.
মতান্তরে অশ্রুপাত

নিয়ে আমি থাকি
আমি ব্যস্ত প্রপাতের
নগ্ন শিহরণ

তাই ঘন পর্বতের
জটিল প্রচ্ছায়া
আমার শোণিতমুক্তি
রটায় স্মরণ

৪.
এই গাছ
জন্মের, অসূয়া থেকে
শুদ্ধ হতে চেয়ে
পাহাড়ে রত্ন
অন্তর্বাস
রেখে আসে

৫.
মিনারের উচ্চতায়
যৌবন সেদিন,
অবক্ষয়জাত সব
সন্ততির ভার
মেনেছে, এখন তাই
অরন্ধন গতি,
আমার গবাক্ষপথে
ভীরু অন্ধকার।

৬.
পার্শ্বীদের মত আমরাও অভিজ্ঞানবহনে
ক্লান্তির অজুহাত তুলিনি

আমাদের পাচার করা হয়েছে
খাঁচায় বসিয়ে
গণিকার সম্মান দেওয়া হয়েছে

৭.
তোমার মোজার তুঙ্গ হ্রদের ছায়ায়
হাঁমুখ শিলীন্ধ্র
এক

তোমারই প্রশ্রয়ে
বর্ষণের আগে দীপ্ত
যুগ্ম রামধনু

৮.
শরীর পুড়ে যাচ্ছে, আগুন
তুই জোগাতে : শপথ আমার—
কাদম্বরী বন্ধু সে হোক,
উস্‌কে দেবে গোপন ক্ষতের
তন্ত্রীবহুল দৈব আবেশ,—
আর সেখানে আমার কেবল
ভস্মাবশেষ—দীর্ণ, অটল।

৯.
সেইসব পুরোনো বন্ধুরাই
ফিরতি পথে দেখা ক'রে যায়

আমার চৌকাঠ অস্পষ্ট
চুলের মাংসে সঙ্গীন এসে বিঁধছে

কবরের গল্প শোনাতে পারে,

সেই সঙ্গ যখন ফিরিয়ে দিয়েছি
প্রতিধ্বনি, একমাত্র
তারই সাক্ষ্য চেনো

১০.
এখনো বাগান তোর
আবদ্ধ, যে তার
বিপুল মহিমা জেনে
সতর্ক দেখি না

এ-ই পরমার্থ, তুমি
ভুলেও কখনো
রুদ্ধবেশ পরিহার্য
রটিয়ো না লোকে

একটা না বই।
সবার জন্য নয়।
দেশী মুরগী, এ্যাই গরু হ্যাট।
একটা শাদা BLACK BIBLE অথবা কালো মুরগীর সাতদিন।
শুভঙ্কর-এর হাত পা সমেত গ্রাফিতিতে পাওয়া যাচ্ছে।

দীপঙ্কর দত্ত

কাবাব

নুন হলুদ পেঁয়াজ ও ভিনেগারে থোল থিতু হয়ে আসি
গ্লাভস আঙুলের ফাঁকে লাথ একর
দিন বুঁজে এলে গ্লাভস স্পিওল
আগুনের গোথরো ঢেউ ঢেউ ডিজাইন
ছেঁকে ফেলছে জ্যাকেট
স্ট্রেচার রুটে দু'পাশে কবাট লাথিয়ে দেখছি
কোনটা আদপে বন্ধ
কোনটার ভেজানো কুয়াশায় হাভাতে বুনোন থেকে
রীট্রিট আধ খাওয়া পা
বেডের টোটাল খিলোনা ইল্লোৎ
চাকু পোচ খামচিতে ছাল বাল হাড্ডি ছাড়ানো
একবার মাটিং আকাশের গ্রীলে ঠ্যাল স্যাণ্ড উইচ
বৃষ্টি অক্সিটোসিন
হাওয়ার দমকা ছড় জানালার আড়ি চিড় সুরতে
ওঃ কি সেরিনেড নেকরের বুনো বুর বদ চরাচর
দাঁত ইস্পাতের ইস্পাতের গলিত জ্যোৎস্না
জ্যোৎস্নার দ্রবণ থেকে ঝাঁঝরা গোস্ত পিণ্ড উঠি
রাত ভর যুঝি আর শেপ নেই
শিক যুক্ত হয়ে আসে শরীর—

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

নদী, নদীহে

…না। এরমানে এই নয়। যে এধরনের ঘটনা। আগে ঘটেনি। ঘটেছে। নিষ্প্রাণ প্রায় গ্রাম্য নদীটিতে…যে নদী জীবন এক…বহুকালদেশবিস্তৃত জীবনেরই বিস্তার এক। সেই নদীর শরীরে। হ্যাঁ, ঝড়ই তো…কখনো এমনও ঘটেছে…নদী চেয়েছে ঐ হাওয়া, ঝড় ঐ নিয়ে যাক তার…তাকে…নয় জল পড়ে থাক বেআব্রু নদীর কঙ্কাল, কর্মশালা। ঝড়ের সাথে, ঝড়ের শরীর হয়ে, সদ্যউদ্গত স্তনদেশে চাঁদের শিশির টপটপ—এরকম স্বপ্ন নদীটা ছাখে, দেখছিল…কতকাল। নিজেকেও হারালে যেন ক্ষতি নেই। মর্ষকাম নয়। অপদর্শন যদিও। তবু…তার…উদরমধ্যে ফড়িং উল্লাস। আর অই। সম্পূর্ণ হারাবে। জেনেও। মৃত্যুকে উপমার কাব্যে উত্তোলন।

কেন কমে আসছে আলো! আগুন। আগুন অর্থে জীবনের তাপ। বেঁচে থাকাকে উচ্চতর মাত্রায় তুলে নেবার ইচ্ছা থেকে নয়। কেবল বেঁচে থাকার ইচ্ছা থেকে নয়। কেবল বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই।

কি ভাবে? কি ভাবতে চেয়েছে। এতকাল? কাব্য ও সৌন্দর্যের গন্ধভাপ, ত্বক-পেশী-রক্ত থেকে টেনে ছিঁড়ে ছাড়িয়ে, দূরে ফেলে দিয়ে; নন্দনতত্ত্বের থেকে উদ্ধার করে, নিজেকে। আরো দূর অদৃষ্ট অসুন্দরে। হারাবে বলে। সুন্দরকে একমাত্র সুন্দর নিয়ে। সুন্দরহীনতায় নীল ডুব দেবে বলে, এমনকি বুদ্ধুদহীন।

ওঃ শুষ্কতা। বড় রুক্ষতা…তাহাদের ত্রিকোণ চক্ষলে। এইবার, কতবার, বহুবার ভুল ঝড় চিনে:

১. অধ্যাপনা। তাঁত শাড়ী। চুল। অনেক। কালোও কুঞ্চিত—অই চুল

জীবনানন্দ পড়া ঐকালের হন্তমৈথুন বিলাসদের ভীষণ ভোলাত। জীবনানন্দ, —নন্দরা সব ছদ্ম আনন্দে ওই অবধিই…বহু অগ্নুৎপাত, এবং বড়সড় হাওয়ার সম্ভাবনা ছিল…পিতার অর্থে (সবটাই সাদা, সাদামাটা টাকা) সিগ্রেট্ ও কনডোম্ কিনেছিল বলে, কেনে ও, কিনবে বলে…হায় হায়, কুক্কুরী কখনো পল গগাঁর ছবিও দেখেনি!

২. নদীর রোদ্দুর কম। সে কোথায় ডিঙিকে ভাসাবে, ডিঙিখানি তাহার ওপর…ডিঙি নয়, ডিঙাই যেন, মধুকর মধুময় বড়। ভাসে, ডুবতে ডুবতে ভাসে। কয়েকটি সাদা সুতো। ওখানে কলপ চলে না। তবু বড়। ঋতুহীন মৌচাক তবু রসের আধার। তখনো তো কার্ল পপার নয়; উইনজেনস্টাইন, কখনো কখনো পাইন গণেশ। বোকা নদী, নদই আসলে, মস্তিষ্কে সেরোটোনিন কমিয়ে শরীরকে কিছুটা অভব্য করেছে।…ভেবেছিল ডুববে। নিজের জলে না, অসংস্কৃত তারল্যে ঐ, কে জানে! তিনটে জেনারেশান ঐ শব্দ প্রয়োগ না করলেও বোধের তরঙ্গ তাকে বকেছিল খুব…অসংবৃত মাগী ঐ, যদিও মাতৃসমা তোমার, গোটাটা খাবে, খাবে কড়মড়। অরণ্য গন্ধ ভুলবে তুমি, নদী হে, ভুলবে, এ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্র-তন্দ্রা। অবলুপ্ত।

৩. কেন তার এতসব চাই? আগে তো চরস ছিল, গাঁজা ছিল—কলাবাগান আর সদর স্ট্রীটে…এখন কেবলই মদ, এখন মানে যখন সে দেখেশুনে প্রাকৃত কুমারী ও আপ্রাকৃত সঙ্গীত সাধিকা দেখে ভেবেছিল এইখানে, সাক্ষাৎ হাওয়ায় হইহই উড়ে যাবে, নৈঋত কোণে। সেই হাওয়া…ভাবোতো আঁদ্রে ব্রেঁতো আর বুহুয়েল নিয়ে, ঐ সব দিনে। নকশালবাড়ী না বুঝলেও সে প্রাকৃত কুমারী প্রাগ্ বুঝত ঠিক। জানতো ভিয়েনার ভাইব্রেটারে শরীর-নিরপেক্ষ হয়ে কাম্ খুশীমত, সহজ সাধনা।…ঐ হিম করা শব্দকে বেকেট্ মিউজিক বলেন কি করে…ভাইব্রেটার তেমনভাবে চেতনাকে ভাইব্রেট করতে পারল না বলে এলিয়ট পড়া ঐ মেয়ে, হায় হায় পেপসি নয়, কোকাকোলা নয়, বিজলি গ্রিলের পাতি বাংলা বোতলে—ইইই—রক্ত কত দেখো, রক্ত-টক্ত…গেল কেন উইণ্ড-ও নেই কোন…অথচ নদী। অন্য এক রক্ত। ঐ শরীর হতেই। খুঁজতে চেয়েছিল। একবিন্দু উষ্ণতা যা হাজার বছর বীজের প্রাণকে সচল রাখে। হিমশীতল রাতে। মাটির স্পর্শহীন। সেই বিন্দু পাবে বলে, এবং না পেয়ে নদী কতরাত স্নেহরিক্ত অবুঝ কেঁদেছে।

৪. চতুর্থ প্রচেষ্টায়, সেই মেয়েছেলে, নদী তারও ঝড়ই চেয়েছে যে ট্রেবলিংকার

গ্যাসচেম্বারের গল্পো সবিস্তারে পড়লে আউট্রামে যেত। ঘাসের ওপরেই, শূন্যগর্ভ প্যাটন ট্যাঙ্কের পাশে, নদীর সারল্য নয় সে চেয়েছে : করে যাক, যাক করে, ব্যাথা নয়—ঝলসে দিক তাকে, ঝলসানো কোনো এক ইহুদি শরীর। সেই হাওয়া, নদীরকতই, কাব্য তাকে নিয়ে,—একদিন ফিরে আসা ফের, ব্যর্থতা নয়, বিবমিষা সার্থকতার সে প্রচেষ্টায়…

এ্যাই, কি হচ্ছে এটা, এসব? কি তুমি? নিজেকেই কি বুঝতে পারছো না? এই তুমি নজরুলকে প্রায় জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়ায় বিজাতীয় ক্রোধে ভেঙেছিলে শার্সি, সব; সত্যি কি করে হয় এসব, এ সব অপকর্ম! ক্লাসিকাল রবীন্দ্রর সাথে মার্জিনাল নজরুল সহবাস! তুমি তো ইকনমিজম্-এর বাড়াবাড়ি দেখে পেচ্ছাপ করেছিলে ইউনিয়ন রুমে, তারপর টেলিফোন ভেঙে, উল্টে দিয়ে টব, এরিকা পাম্। তুমি তো জানো ট্রট্স্কির তত্ত্বেই আজও মুক্তি সম্ভব; জানোতো কোয়ান্টাম ফিজিক্স কি তীব্রতায় আমাদের সন্ধানী করে রোজ, আর ষ্টিফেন হকিং ঐ, ঐ পেন্‌রোজ আর চোমস্কির সিজয়েড বোধ, তোমার তো দূর নয় ফ্রিজফ্ কাপ্‌রা, এরিক ফ্রোম্…তবু তুমি…

—শরীর নৌকাটাই গেঁথে যাচ্ছে পাকে, চড়ার অবক্ষয়ে, তাকে তো জাগাই আগে, চৈতন্যকে ফের তুলে নিতে হবে; চৈতন্য দেবকে নয়। সেই তাপ যাতে ফের জেগে ওঠে—যা চমনম করে দেবে রিফ্লেক্স, স্পাইনাল কর্ড, মেটালা অব্‌লঙ্‌গুটা…এবং তুমি তো জানো প্রমোদ দাশগুপ্তর প্রকাশ্য নকশাল বিরোধ —নিরোধ পর্যন্ত…শুয়োরের বাচ্ছারা সব জীবন-আনন্দ নাকি বোঝে—পড়েছে কখনো ভাদুড়ী সতীনাথ? মাইকেল দত্ত তো কলকাতায় অস্পৃশ্য আঁধার, তোরা আর শিল্প মারাসনি ভাই,…সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা-ভোজী, সারমেয় নির্বোধ বুদ্ধিজীবি সব লকার মাঠে একে অপরের পায়ু মেথুন করতে করতে মার্কসবাদের সঙ্গে ইস্‌কনের, তার সঙ্গে রবীন্দ্রসদন সংসকিতির, তার সঙ্গে আনন্দবাজার ইতরামোর, তার সঙ্গে ভ্যাজাইনাল সিক্রেশান, তার সঙ্গে…

তবু তুমি এইমাত্র নদী, নদী তুমি, অন্যপ্রাণ জলের প্রবাহ। সরমার কাছে কেন যাবে—হেয়ার রিমুভার নেই তার নেই আপার ওয়াল্ড…

বুদ্ধি ঠিক করতে করতে উঠে গেল প্রতাপ ভৌমিক, বাঙাল, মাছের আড়ৎদার : উপক্রত ছিটে ফোঁটা পেলেও, টাকা-পয়সা চেওনা সরমা, তুই তো আমারই

মাছের কারবারী…ভোররাতে, একদা মহাজন এখন (মা) কালী মার্কা ছিপিএম নরেন নস্কর বকুল ফুলের গন্ধের সঙ্গে সরমার গন্ধ মিশলে ছোঁকছোঁক করে, আসে, খুলিতে হয় না, চৌকির কিনারায়, গুটিয়ে তুলে, ঘামভেজা কালো সোমত্ত উরুৎ ভাবো কিরূপ সরমার…এড্‌স-এর ভয়ও জয় করিয়াছে নরেন আমাদের…আপওয়ার্ড সোসাল মবিলিটি যদি এইরূপ হয় যদি এইরূপে সরমার দুগাছি চুড়ি আর পোস্টাপিসে কয়েক হাজার তবে ভেবো অবন্তী বা বৈশালীর সেইসব বেশ্যার কথা; যাদের টাকায় স্বয়ং বুদ্ধদেব, অমন বুদ্ধদেব, ছানাপোনা নিয়ে, দাস রেখে সঙ্ঘ ও বিরামে পরম আরামে নির্বাণ খুঁজিতেন।

আর ঐ মতি বসু, আশিতেও কেমন চটক, বাংলাদেশে বাপ্ লোকনাথের প্রধান রয়্যালটির মালিক ছিলেন, সে, হাফ্ সেন্টেন্স বলা সেই মতি বসু কতবড়…মন্ত্রী, রাজাই হয়তো ডেকে পাঠায়, গপ খপ করে সরমার। মাছ। বল কমেসে গো, বুড়া তো, এট্টুখানি পুচুরপাছুর, রাজ সেবা ভগবান করতি বলেছে, খুলতে খুলতে ঢুকি, টেঁকা লিই না…

না। অনন্তঃ তুমি। একমাত্র জীবনময়, সরমার সৌন্দর্য্য খুঁজোনা। নদী তুমি। জলই জীবন উদ্ভাস। বহুদিন অনশন অভ্যাস করিয়াছে। ভাবিয়াছে বাপুজির অনশন তাহাকে ইংরাজ রাজের সঙ্গে লড়াই-এর শক্তি দিয়াছিল তাহাকেও কাব্য লিখিবার শক্তি দেবে…

হে নদী ঝড় কোথায়, হাওয়াও তো নাই। তোমার জলেও তো নাই বিন্দুমাত্র প্রভা আর। তাহলে অনশন আপনাকে কাব্যও দিল না, দিল না সৌন্দর্য্যও। তৎপরও নদীহে আপনার প্রয়াস ছিল…যে কয়েকটি শেষ চিল উড়ে যাচ্ছে তালগাছ শ্রেণীর দিকে, তাহাদের জন্যেও যেন সমবেদনা, না এম্‌প্যাথি…ওরা বাঁচে আমিও বাঁচি; কিন্তু কথাটা অন্যরকম ছিল: আমি চিন্তা করি তাই আমি, আমার অস্তিত্ব—আবার আজি বিদ্রোহ করি তাই আমরা বাঁচি— একথাও বলা হয়েছে দেকার্তে, কামুরা সব চিন্তাই আসলে—সুবিনস্ত চিন্তার আলপনা, জীবন্ত চিন্তার অবয়ব…তবে লুকাচ্ বা লুক্সেমবুর্গ নয় একদমই নয় ডি-কনসট্রাক্সান—বহুক্ষেত্রে ইনটেলেক্ চুয়াল জাগলারি সব—স্টেল্ জ্যাগারি… কিন্তু জীবনের সমস্যাগুলি তো ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল নয় এগুলি এক্‌সিজ্‌টেন্‌সিয়াল। সার্ত্রে সে বুঝতে পারে কারণ সার্ত্রে জীবন নিয়েই… সক্রেটিস মৃত্যুপূর্বে শেষ

কথায় ক্রিটোকে তার ধার করা মুরগীটা ফেরৎ দেবার অনুরোধ করেছিলেন, হেমলক জর্জর কাঁপা কাঁপা হাত, মুখটা চাদরে ঢেকে নিয়েছিল। সুবিমল মিশ্র বলেন, মাও এখনো জন্মাননি আমার দেশে ; এ কবর কলকাতায় এথেন্সের কথাও তো জারিত হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার উচ্ছাস, নবজাগরণ না নয় তাই নিয়ে লড়ে যাচ্ছে আজও। তোরা কি ছিঁড়লি ? মাল খেয়ে রাঁড় বাড়ি গিয়েও মাইরি একটা হরিশ মুখুজ্যে হ, কালীপ্রসন্ন হ, হ রামমোহন, অক্ষয় দত্ত···তা নয় তোরা সব প্রতিষ্ঠানের চেন বাঁধা ইংরিজি নামওলা প্রয়োজনে মালকিনের কামবাই মেটানো কুত্তা হবি তোদের কি হবে র‍্যা !

ওগো মা কেন আমার চিন্তা করার মত একটা খারাপ অভ্যাস দিলে ? শাহর আমলে অত্যাচারীত এক র‍্যাডিকাল যুবকের খেদ—রেফার টু কাপুচিনস্কি, শাহ অব শাহস। এই চিন্তা করার ক্ষমতাই সব অত্যাচারীকে প্রোভোক্ করে, কেন চিন্তা করিস বাপ বরং নিবার্ণে নিজের বান ধরে বসে ঝিমো··· চিন্তার জন্য নিভে যাওয়া প্রাণগুলিকে সগর রাজার পুত্রদের মত সে গঙ্গার চেয়ে বহু ক্ষুদ্র হয়েও ফের জাগাতে চায়, সে নদী, নদই আসলে। সে গঙ্গায় মেশে না, গঙ্গা ভেদ করে, পঞ্চনদ পার করে, ইউফ্রেটিস তীরে, ওখান থেকে কি কৃষ্ণ সাগরে যাবে ?

সর্বহারা, সর্বস্বহারা সে—উহার আশ্রয়ে কি দেখিল ? প্রাণপণ আকুল মিনতিই যেন, এক্জিসটেন্স+ইনটেলেক্ট, ঐ ক্ষুদ্র কৃষ্ণ কেশদামের মধ্যে পিচ্ছিল গুহামুখ, পালাতে চেয়েছে সে, না প্লিজ ফ্রয়েড্ দিয়ে সব বিচার করবেন না···একটু ইয়ুং এ্যাড্লার অটোর‍্যাংক পড়ুন ; রিগ্রেসান আর ম্যাসোচিজম দিয়ে জীবনের সবকিছু ব্যাখ্যা করার মত মূর্খ কিভাবে হন। ফ্রয়েড সুতীব্র মেধা তাবলে তিনিও শেষ কথা নন। লুকোতে চেয়েছে সেখানে। সব ছেড়ে ; জামাকাপড়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্মৃতি, বংশনাম—সব বাদ দিয়ে, নতুন প্রাণস্পন্দনের মত। লুকোতেই চেয়েছে, চেয়েছে তন্দ্রাচ্ছন্ন শুয়ে থাকতে কবোষ্ণ সরোবর জলে। মুখ জিভ ঠোঁট দিয়ে চাটে, চেটে নেয় মাটির গভীরের লাভাস্রোত···

এখন হাওয়ায় ভাসছে সে ! জানে এই হাওয়া একদিন ঝড় হবে, কালান্তক ঝড় এবং যা মুছে দেবে ভিতর বাহির···শংকর ভাষ্যের বিরুদ্ধে এই তার টিকা

লেখা শুরু, কিছুই মিথ্যা নয় হে ; ওগো পাথরপ্রতিমা তোমার ঐ, ঐ···ওতো মিথ্যা নয়···

ওগো নদী। নদী হে। দ্য থিক ব্ল্যাক টাফ্ট্ অব হেয়ার ইন্ বিট্উইন হার থাইস ইনভাইটস দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, টু ডিভার ইট ; ওনলি টু বি—জেনারেট ইট এগেন্—উইথ মাচ মোর উইসডম এ্যাণ্ড প্যাশান। ওহ্ কাম। কাম্, আই অ্যাম কামিং, হোল্ড মি হার্ড···

শ্রীধরের গদ্যের বই খুঁজতে খুঁজতে

বইমেলার পর আবার গ্রাফিতির ঠেকে

পাওয়া যাচ্ছে যে কোনো রবিবার···

নিপা ঃ একদিন, অন্যসময়

নিরিবিলি গান

অমিত মিত্র

বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত কুশিক্ষাকবলিত মেয়েরা ষোলো থেকে দু'তিনবার প্রসবের দায় সামলে কুড়িতেই কেমন কালিয়ে যায়, সঞ্জীবের ঠিক তেমন কোন অল্পবয়সী বিহ্বলতার দাগা না-থাকলেও অবস্থা প্রায় একই রকম—তিরিশ বছর হলো, 'প্রণয়ের পালা ঢের এল-গেল', তথাপি মিলন না হলেও অশিক্ষা ও অন্যান্য দায়িত্বের বোঝা সে এড়াবে কী করে!—উপরন্তু এখন একেকদিন দেখে কীনা—বাঃ চমৎকার দু-একটি শ্বেতশ্মশ্রু অগোচরে বেড়ে-বেড়ে হঠাৎ প্রকট-প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। তিরিশ কেন, মাথার আদুরে প্রিয়-প্রিয় চুল তার অনেক আগে থেকেই নিয়মিত ঝরে যেতে শুরু করে, কোনভাবেই এ বংশানুক্রমিক বিপর্যয় আটকানোর উপায় নেই দেখে বরং তার প্যাটার্ন নিয়ে সে দার্শনিক হয়ে পড়ে কিছুদিন, অবজার্ভার-রা দেখেছে সাধারণত চুল পড়ার চার-রকমফের আছে—এছাড়া ওসবের ধার না ধরে গোটা মাথাটাই কামিয়ে নিয়ে তারপর রীতিমতো রংচং করে নিলে কেমন হয় ভেবে অবশ্য সিঁটিয়ে গেছে সঞ্জীব—ধরা যাক ভারতবর্ষের নিম্নমধ্যবিত্ত সেট-আপে এহেন রূপারোপ কীরকম সামাজিক কেওস-কেত্তন মথিত করে তুলবে?—তারপর কি কাজ পাওয়া যাবে, চাকরি তো সে করবে না, কিন্তু স্বাধীনরকমের কাজ পেতে হলেও রূপী বাঁদর সেজে গিয়ে দাঁড়ালে বহুদিনের পরিচিত লোকেরাও যে বিলক্ষণ চটবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—পাগল, রোগগ্রস্ত, বিপজ্জনক নান্দনিক—চাপা বিদ্বেষে জনতামুখর কোলাহল প্রথমে সরে গিয়ে তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর—বাপের পয়সা থাকলে অবশ্য এসব ফ্যাশন করাটা কোন ব্যাপারই নয়, তখন সেটা দারুণ হবে, লোকে বেশ মুগ্ধ হয়ে দেখবে—আর তোমাকেও তো সেক্ষেত্রে কারও কাছে হাত পাততে হচ্ছে না, বরং হাত বাড়িয়ে দু'একজনের জন্য বদান্যতা প্রকাশের বিলক্ষণ সুযোগ থাকছে—ঠোঁট অবশ্য সর্বদাই ব্যাঁকানো থাকবে—বাংলা শব্দ-বাক্য জিহ্বা ও সফিসটিকেশনের যুগপৎ প্রহারে সেক্ষেত্রে কুঁকড়ে কেমন থিন, চিকন চামড়ার মতো জেল্লা দেবে—সে এক বাংলার বিরল

সৌভাগ্য! আর হ্যাঁ, এক্ষেত্রে কুড়িতে কেন, উত্তীর্ণ ষাটেও কামবোধ তীব্র থাকে, চরিতার্থতার অবকাশ জোটে, এবং পুরুষেরা পিকাসো-র মতো বহুদাকার ষণ্ড, আশিতেও পয়দা করলে অবাক হতে নেই।

এই এক বিপদ হয়েছে, সঞ্জীবের শ্রেণীচেতনা যে-হারে আক্রমণ-উদ্যত, নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো, ইম্‌ম্যাচিওর বোকার মতো শ্রেণীঘৃণা যে-হারে তেতে ওঠে ঐ যাদের পয়সা-থাকার দরুন স্বাধীনভাবে সবকিছু মাড়িয়ে-মারিয়ে এক বিকৃত বীভৎসা-র তৈরি হেজিমনি-র চাট সামলাতে হয় আমাদের—যে-হারে তার নাচনকোঁদন দেখে জ্বলেপুড়ে ওঠে সে—হায়, তার কিচ্ছু ক-রা-র নেই—শুধু দেখা, অথবা না-দেখা—উল্টোদিকে এইসব সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত ভাবনাপ্রদেশের জাহান্নমে পাঠিয়ে বরং নিজের অভাব-অভিযোগ-দুর্দশা নিয়ে চাপা ক্ষোভ, ওপরে ঠাট্টা, ভেতরে বেদনা—এইসব চাষাবাদ ইচ্ছে-অনিচ্ছের দ্বন্দ্বমন্দে চলতে থাকে—এদিকে তিরিশ বছর হলো—পুরুষার্থ কিছুই অর্জিত হলো না—চোখ ক্রমেই ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, চারপাশে কলঙ্ক মালার মতো বাড়ল, রক্তমাংসের উত্তেজনা টের পাওয়ার আগেই থরহরি অস্থিকম্পনে সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল একেবারে খোদ দৌড়ের ট্র্যাকেই। আসলে এহেন হীনম্মন্য হতাশার হাত থেকে গোদা হে, রেহাই নেই কোন—এ প্রায় একধরনের আত্মরক্ষণের কৌশল মাত্র। আর-একরকমও হয়, উল্টোরকমও হয় যে নিজেকে বিরাট পণ্ডিতম্মন্য উদ্দীপনার হাতে ছেড়ে দিয়ে একে-এককে-তাকে খুঁচিয়ে-জালিয়ে বেশ একধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করা—তারপর আড়ালে-আবডালে কে কী বলল—তাতে গাছের ডালে উঠে লেজ নাড়াতে বাধা নেই কোন—তো সঞ্জীবের সে-আর ইহজীবনে হবে না—সঠিক অর্থে সজীবভাবে নিজের পরিধির মধ্যে নিজেকে অ্যাসার্ট করতেই কালঘাম ছুটে যায়—এমনকী লজ্জাও হয় নিদারুণ। মানুষ হিশেবে এক সৌম্য শান্ত প্রান্তরের মতো ছান্দসিক হাওয়ার বিহ্বলতা ও ভালোলাগা, জীবনের প্রতিটি ফ্যাসেটের প্রতি সমভাবে উদগ্রীব ও রেস্‌পনসিভ—উজ্জ্বল কিন্তু উগ্র নয়, বিষাদী কিন্তু নিষ্ক্রিয় নয়, সর্বদা সক্রিয় কিন্তু সে চারপাশের হাওয়া-জল-নির্মাণের সাযুজ্যপরিণীত—এরকম এক প্রতিমাপুরুষে, এমন এক বৃক্ষরসের ভিয়েনে নিয়োজিত কর্মীর দেখা নিজের মধ্যে পাওয়া যাবে কীনা—হৃদয় তো কুঁকড়ে কালো হয়ে থাকে বিশ্বাসহন্তার মারে; শরীর অন্য শরীরের প্রতি যত্নবান হবে কী করে—তার আগেই কে যেন নির্মমভাবে ছেঁটে দেয় তাকে। চৌকো-চৌকো

জানলাহীন কাঁচের বাক্সের ঠাণ্ডা দেওয়ালে মানুষের ছবির গায়ে ভয়ে-ভয়ে হাত বুলোতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খায় শুধু, তারপর দেখে এ-মায়া অর্থহীন—দার্শনিকেরা যে-কথা আগেই বলে-বলে গেছে, সেক্ষেত্রে আবার মাথা না একান্তই মুড়িয়ে দেখতে হবে কোথায় মানুষের মানুষকেই দরকার আছে শুধু—অর্থে নয়, স্বার্থে নয়, ব্যর্থতার অনুভবেই হয়তো, বদলে। এক্ষেত্রে নানাবিধ উচ্চনীচ ধ্যান ও ধারণা-র আভাস থাকলেও সঞ্জীব বুঝতে পারে এ-ও আসলে তার অবস্থানজনিত দেখা এবং বিরাটকায় বোঝা। আজ দশবছর ধরে তাকে উল্টেপাল্টে ছেনে-ছেঁচেও নিজের অকাতর ফাঁকিবাজি, মনকে চোখ ঠেরে নানান গতাগতি—না, তার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না—বা হয়তো এভাবেই চলে যাবে যতবার সমস্ত তত্ত্ব, উত্তেজক কথাবার্তা, সামান্য কাজটুকু শেষ হবে, নিজেকে নিজেই দেখতে হবে সামনে, আয়নার দরকার নেই—এমনিতেই কি বোঝা যায় না যখন নিজের জন্য নিজেকে নিয়ে টানা, গড়ানো, ক্লান্ত দু'চোখ মেলে দেখা? হায় কর্মহীন প্রহর—এমন প্রহার কেন করে?

সঞ্জীব বরং দেখে নিছক কর্মসক্রিয় থাকারই দ্বন্দ্ব কতরূপ—ছন্দগন্ধ তো কোথায় কী, তার বিশ বাঁও মেলে না—উপরন্তু এখন নিতান্ত তিরিশেই হাত-পা-মাথা কেমন ক্লান্ত হয়ে আসে—মধ্যবিত্তের সাংসারিক রুটিন-বহির্ভূত সামান্য এদিক-ওদিক চাউনি, নেমে-পড়া, সাঁতরানোর মৃদুমন্দ চেষ্টা, হাঁটা, ডুব-দেওয়া, তাতেই কী জগ্‌মী পরিবেশ সৃষ্টি হলো, জাগতিক প্রভাব-পরিবেশ প্রায় কিছুই পাল্টাল না, এমনকী বদলে-যাওয়ার মতো সংকল্পে অস্থির বন্ধুবান্ধব, সময় ও জীবন, যাপন ও চর্চা সমস্তই কেমন চিড়িয়াখাঁচায় নেতিয়ে স্থির স্থবির হয়ে মরে গেল—আর যেটুকু জীবনের স্পন্দন তবুও তথাপি থেকে যাচ্ছে, তাকে দু'হাতের অনন্তছিদ্র যতনঘরে বাঁচিয়ে রাখা, সে-ও যেন নিবু-নিবু হয়ে এল, তবু নাকি নস্ট্যালজিয়া-র নায়কের মতো আবার এবং আবার তাকেই নিয়ে যেতে হবে দিনক্ষণ-তিথিনক্ষত্র দেখে—মনস্কামনার নিকুচি করেছে—এই যাত্রা ও আত্মার প্রতি আস্থা অর্জনটাই কি বড় কথা নয়! আর কী হচ্ছে—তিরিশেই তার হাতের জোড় খুলে যাচ্ছে—কিছুকিঞ্চিৎ জীবনের প্রান্তিক ভাষা হাতড়ানো'র চেষ্টায় পেটের ভেতর ঘা-দাগ বেশ স্থায়ী হয়ে বসে যাচ্ছে—অথচ এই আন্তরিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়তে হলে কী জাতীয় লৌকিক নিয়মেছন্দে অভ্যস্ত হতে হবে—তার প্রায় কিছুই তো জানে না সঞ্জীব।

এদিকে যতটা অসুস্থতা, যতটা মৃত্যুগন্ধী জীবনের ধারেকাছে চোখের পৃষ্ঠা নিভে আসে, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—যার দিকে হয়তো এতকাল কোন নজরই পড়েনি, সামান্য স্বাস্থ্যশরীরের কিছু কিছু ইস্কুলে জানতে হয়েছিল অথচ তেমন চিন্তিত হতে হয়নি—সেসবও এখন খুব জেগে বসে আছে, জানান দিচ্ছে, থেকে-থেকে কামড়ে দিচ্ছে, (ধরা যাক কত প্রতিকূল পরিবেশেই না মনুষ্যের আশার তরণী বয়ে চলে,) সেরকম তো নয়—শুধু ক্লান্তি, শুধু শরীরের নিজস্ব চাপেতাপে এক অমেয় এনার্জির ঢেউ ভাঙা, পাড় ভাঙা শব্দটাই বেপাত্তা, উদ্যম-উৎসাহ, জ্যোতি কেমন বেপথু, ম্রিয়মাণ শুধু—আর দেখা যে আহা সেই স্থূল শারীরিক চাহিদা কি শেষ হয়ে এল—কোথায় ঘাটতি—সবটাই কি এরপর সূক্ষ্ম শরীরের বাহুপাশে, বায়ুমণ্ডলের আশপাশে ঘুরে-ঘুরে মরা!—কে জানে এতটাই ঘন নির্বেদ সে ফেটিয়ে তুলল কীভাবে! ভেবে দেখলে অবশ্য তার কারণ শুধু সাম্প্রতিক বিপর্যয় মাত্র নয়, আরো গভীর কিছু সূত্র হয়তো পাওয়া যেতে পারে, যে-কারণে মুখচোরা, ভয়ানক অন্তর্মুখীনতা ভেতরে-ভেতরে বাড়িয়ে তুলেছে এক ব্যক্তিগত বিদ্রোহের ধ্বজা, ব্যক্তিগত ক্ষীণ স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ, জোরাজুরি-র বিরুদ্ধে প্রায়-কঠোর আচরণ, নির্মম, এমনকী অশালীনও কখনো-কখনো। শান্ত সুস্থিতির বদলে এক ক্রম-অস্থির ঝটাপটি, মাথার ঠিক নেই, তখন বাহ্যবাস্তবের নিয়ন্ত্রণহীন ফেঁপে-ওঠা কদাকার কেবলই নিজের মধ্যে নিজেকে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য করে। সে ছবিটা ঠিক কীরকম?

প্রাজ্ঞ হয়ে-ওঠার বদলে সে বরং বুড়োটে মেরে যাচ্ছে—চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে, শিথিল হয়ে যাচ্ছে মাংসপেশী, ইন্দ্রিয় সকল শুধু আছে পারসেপশন তো নেই। তো, এর জন্য সে দায়ী কাকে করবে? সমাজ-সংসার-প্রতিবেশই দায়ী? নাকি, এতকাল কেন সে নজর রাখেনি, ভাবেনি কেন যে শরীরের নাম মহাশয়—সওয়াতে গিয়ে তাহলে কী সইল শরীর? নাকি অবিরাম অপুষ্টি? তৃতীয় বিশ্বের জীববাসিন্দা হিশেবে এই তো স্বাভাবিক—তাহলে যে রাস্তায় বেরোলে এত চর্বির উত্তেজ, স্বাভাবিক যৌবনের বিপথগামী তেজ, হাসি, পোশাকের বিপুল বৈচিত্র্য, বৈশ্বিক খাদ্য-উপচার,—তার অর্থ কী? অথবা এই চিক্কন স্রোতের পাশে এক কালোকোলো রুগ্‌ণ, স্তব্ধবাক্ মনুষ্যপ্রবাহ জীবনের যে-স্বাদে অভ্যস্ত তার কোন হদিশ কেন পেল না সঞ্জীব—শ্রেণী-অবস্থানের ঘুরঘুরে খেলায়, গোলকধাঁধায় সে কোথাও যেতে পেল না—নিজেকে নিয়ে একা হলেই ব্যস্ত

পড়ে থাকল—হায়, আমার কী হবে—বন্ধু নেই, পত্নী নেই, কোন্ সম্পর্কের রচিত স্থাপত্যে আস্থা ও নির্ভরতা পেলে এ-ব্যক্তিস্বাদ তিক্ত ও কষায় থেকে মধুরের দিকে যাবে? শুধু তার স্পর্শ পেয়েছে, ইঙ্গিত পেয়েছে, স্থায়িত্বের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করা মাত্রই কে যেন অনিশ্চয়তা ও ভঙ্গুর অঙ্কের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে? হায়, এরপর আর কোন্ গড়নক্ষপের কথা সে বলবে?

ইতিমধ্যে গরমদেশের লোক হিশেবে কিছুদিন সে পাগড়ি নিয়ে ভাবে—আহা দেশোয়ালী মারবার, জাঠসর্দার—কী তাদের পাগড়ির বাহার—এসব কেন ফ্যাশনে আসে না আহা! বা ধরা যাক ভিন্দ্রানওয়ালের ৩০ গজী রেশমীগৈরিক মাথার সাজ, বা নিদেনপক্ষে লাগ্‌সই একটা টুপি নিলেও মাথাটা বাঁচে—রোদ থেকে, হিম থেকে—তবে কী না গান্ধীর টুপিটা হবে বাড়াবাড়ি, খুব স্ন্যাণ্ডাল-বিবেচক। তার চেয়ে আদিবাসী সমাজের উৎসবমুখর সংস্কৃতির দিকে চলে যেতে ইচ্ছে করে সঞ্জীবের—সর্বত্র স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য দেখে, কোনদিকে ঢাকার বেদনা নয়, বরং এক স্বাভাবিক দিনান্তদৈনিকের ঊর্ধ্বে জীবনানন্দের সহজ প্রকাশ দেখে তার মনে হয় ওফ, রেখেছ কেরানি করে, মানুষ করোনি—সেই শার্ট সুতির কোট পেরিয়ে, টেরিলিন-টেরিকটে কিছুদিন মেতে, সিন্থেটিক-পলিয়েস্টারের দিব্য দাসত্ব করে এখন পরেছি জিনস্ আর ক্যাজুয়াল টপ—কী ঢপে সেজেছি মাগো—আমার জাতীয় পোশাক কই—মেয়েগুলো সালোয়ার-কামিজে দূরদর্শনের প্রতীকি একতা, ছেলেগুলো উৎপটাং, অফ্‌বিট অ্যামেরিকান, —হাঁটাচলা পর্যন্ত পাল্টে গেল গা—সঞ্জীবও অগত্যা যে এই স্রোতে পড়ে হরিদ্রা-শ্যাণ্ডলা—সে-বেশ নরম-নরম, কোথায় কঠিন হবো—বাজার ফেঁপে উঠে একদিকে যে সংকুচিত হয়ে এল—হস্তচালিত তাঁতের প্রতি উৎসাহ দেখালেও আসলে রেয়াৎ নেই কোন—লোকে হাসে—লোকে বলে আহা ঐতিহ্যপ্রাণ, তো ছেঁড়া কাঁথাই ভালো—লোকে মোটেই লোকশিল্প পোছে না। শহরে তো লোক নয়, সমাজ নয়, ব্যক্তির প্রতাপে কিছু সমিতি মাত্র চলে, শহরে সংঘের কাজ হলো লোকের মাথা বেমালুম মুড়িয়ে লোকহিংসার অবিরাম চর্চা করা। মারাত্মক টানাপোড়েনে সঞ্জীবতাই আপাতত ঘোমটা টেনে ফেটে যায়। রাত্রে তার হঠাৎই উক্তি-র কথাটা মনে হয়—এইসব প্রাচ্যসভ্যতার দেশ ঘুরে এখন ইউরোপে-অ্যামেরিকায় শ্বেতাঙ্গ স্ত্রীপুরুষে সারা গায়ে স্থায়ী-অস্থায়ী উক্তি এঁকে যাচ্ছেতাই করছে—মহাদেশব্যাপী তার প্রতিযোগিতা হচ্ছে—ও মাগো—আর সে কোন

প্রতীক নয়, চিহ্ন নয়, সম্প্রদায়, বিশ্বাস, সামাজিক বন্ধন, পরিচিতি নয়, এ এখন সেক্যুলার ফ্যাশন—তার ক্যাটালগ আছে, তৎপর সেলস্‌ম্যান আছে, যে যার ব্যক্তিগত অর্ডারমাফিক যা-ইচ্ছে এঁকে নিতে পারে আজ শরীরের যে-কোন অংশে। হা, এই তো হয়েছে ঠিক, মাথায় বেশ সুন্দর মেঘের প্যাটার্নে উল্কিই এঁকে নেওয়া যাবে তাহলে—প্রাচীন টেক্‌নোলজি কতদূর উন্নত হয়েছে সে তথ্য খালি জানা দরকার ইতিমধ্যে।

এই করতে-করতে সঞ্জীব একটু-একটু সারছেও, শরীরের ভেতরে বেশ একটা রক্তের চলাচল টের পাওয়া যাচ্ছে, যতটা নেতিয়ে পড়েছিল তার ইচ্ছে-অনিচ্ছে সাধ-সংগ্রাম, না-মরা স্বভাবের বিধিনিষেধ মেনেই আবার সেসব চাগিয়ে উঠছে। মনের জোরালো ছবি হাঁকড়ে বেড়াতে চাইছে এই সমূহ বাস্তব, দেখতে চাইছে, শুনতে চাইছে, এমনকী শোনাতেও চাইছে রক্তের নিরিবিলি গান। ওষুধে-অসুখে সে এখন ঈষৎ বেগুনি, তথাপি কোন গোপন প্রকোষ্ঠে লালও জন্মাচ্ছে ভেবে কীরকম অদ্ভুত লাগে, কীরকম অবুঝ লাগে এই রক্তবিষয়ক তাবৎ সভ্য ব্যবহার, গল্প, আচরণ, মানুষের বিচিত্র সাহকি। এই সেই স্বাস্থ্য, হয়তো এই সেই প্রাণ, ল্যাবরেটরিতে তথাপি আজও রক্ত তৈরি করতে পারেনি মানুষ। অ্যানিমিক, রক্তপাত হলে খুব বেশিরকম, অভাব ঘটে গেলে, ক্ষরণ হলে অবিরাম, বা রক্তের কোন দোষ থাকলেও মানুষ এক্ষেত্রে মানুষকেই চায়, অন্য উপায় নেই। তারই জন্য ব্লাড ব্যাঙ্ক, তারই জন্য ডোনেশনের মহড়া, কত লোক রক্ত বেচেই জীবিকার্জন করে থাকে আজ। আস্তে-আস্তে রক্তের দাপাদাপিও টের পায় রাত্রিবেলা, সঞ্জীবের ঘুম আসে না, সঞ্জীব জেগে থাকে, তিরিশ বছর হলেও এই ক্লান্ত শরীর নিয়ে, রোদে-পোড়া, জলে-ভেজা, যৌবনের মাঝামাঝি প্রণয়ের জন্য অতি অধীর হয়ে ওঠে, অপেক্ষা করে, ভালোবাসে মন দিয়ে, শরীরকে চায়, স্পর্শ করে, হাত ধরে বলে ভালোবাসি, মুখটা উঁচু করে তুলে ধরে সমস্ত সত্তা দিয়ে গভীর চুম্বন করে, চোখের ভেতর দিয়ে এক উল্টোজগতে চলে যায়, আবার যতক্ষণ না সেই ইমেজ সোজা হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করে, ততক্ষণ স্রোতে ভেসে যায়, ঢেউ আটকায়, তারপর ছেড়ে দেয়, গভীরে প্রাণ ঝরে পড়ে, সঞ্জীব উবু হয়ে বসে তার প্রাণভিক্ষা করে।

আস্তে-আস্তে সেরে উঠছে সঞ্জীব, আস্তে-আস্তে ফিরে পাচ্ছে শরীরের গরম দুপুর,

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠছে শরীরের ভঙ্গি, শুয়ে-শুয়ে স্বাস্থ্যের, সুস্থতার খোয়াব নয়, কিছু-কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলায় বরং আরো তাড়াতাড়ি ফিরে পাচ্ছে স্বাভাবিক এনার্জি, মনের দাবিগুলি মেনে চলার কথা শরীর ক্রমশ স্বীকার করছে। তাহলে অসুস্থতাকালীন এইসব জবানবন্দির মানে কী? জরা ও মৃত্যুর এই নৈকট্যসম্ভাবনায় উচ্চারিত প্রলাপ? তবে সে কী চায়? অক্ষয় যৌবন চায় নাকি? যৌবনের ব্যবহার্য চায় নারীদেহেয় সংযোগলাভে? জরা ও মৃত্যু দেখে ভয় পায়? রুগ্ন অব্যবহার্য শারীরিক আক্ষেপে জড়িয়ে যায় তার মনের অস্বাস্থ্য? এ মনের কী রকমের বিকার? এক্ষেত্রে মুক্তি কোথায়? মুক্তি কীভাবে আসে? অবদমন নয়, কিন্তু চিরকালের সাধুরা বলেছে সংযমের কথা। কী আশ্চর্য, যৌবনরক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা হলো যৌবন না ক্ষয় করা—যদি তা ক্ষয়ই না করা যাবে স্বেচ্ছামতো, তবে তার অনুভব হবে কীভাবে? তবে তার ব্যবহার হবে কী? এই আত্মগত যৌবনের বোধ কীভাবে ক্রিয়াশীল হবে পরিপার্শ্বে! সঞ্জীব টের পায় এই বিচিত্র বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বের নিরসন খুব কঠিন, একে বোঝাই প্রথম তো কঠিন তারপর তার অভ্যেস—সঞ্জীব এই পর্যন্ত এসে ছেড়ে দেয়—ঠিক আছে—এ তো আর লেখার বিষয় নয়, নিজেকে নিজেই দেখার বিষয়—আরো বহুকাল—সঞ্জীব, দেখবে, দেখতে-দেখতে যখন লিখবে, তখন লেখা হবে দেখার পরিপূরক—দেখা-কে বাড়িয়ে দেবে, দেখা-কে বুঝতে সাহায্য করবে—সঞ্জীব বাড়বে—সক্রিয় থাকবো না হলে তো হবে না—দ্বন্দ্ব যেমন সর্বদা সক্রিয়—দ্বন্দ্বের আপাত-নিরসনও হবে সেইভাবে। এ ক্ষেত্রে সঞ্জীব কোন পরচুলা কোনদিন ব্যবহার করবে না।

র. কা.—১৯৯০

অরূপরতন বসু

অলীক তারবার্তা

যেন শূন্য থেকে এলো এই টেলিগ্রাম; ওর ছোটো ছোটো তীক্ষ্ণ শাদা দাঁত অদৃশ্য এক কামানের গোলার ঘায় আত্মার ভেতর জাহাজ ভাঙতে ভাঙতে, সাংঘাতিক আওয়াজ একটু-ও না-তুলে চুপচাপ তুমুল এক অগ্নিকাণ্ড ছড়িয়ে গেলো চ'লে, কবিতার স্বভাব অনুযায়ী; আমি বসেছিলুম যেন আমার কিছুই করার ছিলোনা; শার্সির পাশে তক্তপোশের ওপর ছিলুম বসে—এই তো আমার ঘর। টেবিলের ওপর ঐতো দাঁড়িয়ে রয়েছে গেলাস—আমার চিরদিনের শত্রু, আমার সাথি, কেননা ওর ভেতর রয়েছে আমার আত্মা। বিশ্বাস করো। কিছুতেই আমি ওকে টুকরো করে ফেলতে পারিনি; কত বারই তো কতোভাবে চেষ্টা করলুম, আছড়ে ফেলে দিয়েছি ছুঁড়ে, পিস্তল চালিয়েছি ওর জলপাই-এর রুপোলি নক্সার ওপর, বেদম মেরেছি শংকর মাছের লেজ দিয়ে; তবু কিছুতেই কিচ্ছুটি হবার যো নেই; ও যেখানে ছিলো সেইখানেই আছে। এই নয় যে আমি ভয় পেয়েছিলাম পাছে ও আমার ভীষণ কোনো বিপদ ঘটায়; এই নয় যে ওর স্বভাবটা-ই খ্যাপাটে; তবু বিশ্বাস করা যায় না ওকে শুকনো বারুদের মতো, কখন যে বিস্ফোরণ ঘটায় তার ঠিক নেই। তবু ওকে আমি পছন্দ করি; কেননা না-করে উপায় নেই আমার, কেননা ভগবান এই গেলাসটিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আমার-ই জন্য। কাজেই এখন হয়েছে আমার মহা জ্বালাতন, কী ক'রে সামলাই ওই পাগল গেলাসকে। এই তো ভোরবেলায় পাগল হয়ে উঠলো ও; এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো,—বিমান-ঘাঁটির হ্যাঙারে ছোট্টো রুপালি টয়-বিমানের মতো—টেবিলের উপর, এক্ষুণি ওর ধবল এঞ্জিন থেকে গান বেজে উঠলো তারস্বরে। এখন ভোরবেলার সমস্ত বিষয়হীনতা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সারি বেঁধে হাই তুলতে লাগলো; ঈশ্বরের উদাসীন আঙুলের টোকায় আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগলো বুড়ো সূর্য; আর ধবধবে বাষ্পে

মোড়া শূন্য আর গভীর অন্তর্দেশ থেকে দেবতার অরগান বেজে উঠলো লুঠনের, আর ঐ গেলাস উঠে পড়লো হাওয়ায়, ফর ফর ক'রে উড়তে লাগলো ফড়িঙ-এর পাখার মতো আওয়াজ তুলে, আমার মনে পড়ে গেলো সিথেরার সেই ফুল ঝরানো স্বর্ণাভ হাঁসের ঘুরে ঘুরে অবিরল ওড়ার কথা। দরজা বন্ধ আছে আমার, শার্সিও বন্ধ, সূর্যকে এখন লাগছে মলিন আর ফ্যাকাশে এক কমলালেবু, আসলে ধোঁয়া আর কুয়াশায় যেন তৈরী হয়েছে চমৎকার এক শবাধার, রাস্তায় ঘাটে লোক ছিলো কম, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় পাক খেয়ে উড়ছিলো পাগল কাক; বৃষ্টি পড়ছিলো গুঁড়ি গুঁড়ি। এই সকালে আমার কাছে কেউ আসবেনা জানতাম, তবু তো টেলগ্রাম এলো এরই মধ্যে। যেন চারিদিকে তুষারপাত হবে—এমনই আয়োজন হচ্ছিলো, নীরবতায় ভরে উঠছিলো কাঠের বাক্সের মতো ঘর-দোরগুলো; বৃষ্টিতে সামান্য ভিজে গিয়ে যেন ওরা চিন্তা করছিলো চুপচাপ কী আছে ভাগ্যে তাই নিয়ে। আসলে আমি-ও অপেক্ষা করছিলুম, একটার পর একটা ট্রাম যাচ্ছিলো কোনো শব্দ না-তুলে, আর আমি ভাবছিলুম ওদের প্রত্যেকটিই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঈশ্বরের কোনো-না-কোনো ইচ্ছা। ঐযে শাদা সার্ট আর ট্রাউজারপরা একটি লোক দৌড়ে গেলো ট্রামের দিকে, উঠতে পারলোনা ও, জোরে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো ট্রামগাড়ি; ওর জন্য আমার কষ্ট হলো, ও কী আর সারা দিনে সেই গাড়িটিকে পাবে? অথচ তা ও জানতেও পারবে না, তা নিয়ে কোনো দুঃখ-ও নেই ওর, সারাদিনে হবেও না। অথচ কিছুই কী ও হারালোনা? এইবার হঠাৎ এক দুঃখে আমি আপ্লুত হলাম; সঙ্গে সঙ্গে ভয় হলো আমার অথচ কী-ইবা হারাতে পারতুম আমি, কী ছিলো আমার দেয়ার, নেওয়ার? কিছুই তো না। শার্সির উপর আস্তে আস্তে জমে উঠছিলো গুঁড়ো গুঁড়ো জলের ফোঁটা, তখন ট্রামগুলো স্থটাম শাদা মাছের মতো যাচ্ছে চলে, জানালাফেলা, সাম্নে আলো জ্বলছে, চোখ ফিরিয়ে নিলুম; ঘরে কাপড় শুকোনোর তার থেকে ঝুলছে গত রাত্তিরের নোংরা আণ্ডারউইয়্যার, তলার দিকটা হলুদ হয়ে উঠেছে নোংরায় আর এ্যাসিডে, মনে হলো—আমার কোনো কুকীর্তির সাক্ষী ওটা, মেরে-ফেলা পাখি, দুটো পাখা মুড়ে ঝুলছে; তবু আমি আশ্বস্ত হলুম কেননা ও আণ্ডারউইয়্যার, হলেও, বন্ধুর মতো যেন তাকিয়েছিলো, আর একটু পরে ওকে আমি কাচবো তাই সুখী দেখাচ্ছিলো। আঙুল দিয়ে কাচের ওপর থেকে ময়লা জলের পাৎলা একটা

পর্দা দিলুম উঠিয়ে; জায়গাটা হয়ে রইলো আমার চোখ, আসলে ওটাকে মনে হচ্ছিলো লেন্স, আর তা মনে হওয়া মাত্রই আমার আত্মা উঠলো নেচে ফুলের মতো, ক্যামেরার লেন্স ছিলো আমার কাছে মহাবিস্ময়।

যেন ঐ লেন্স আবিষ্কার করতে পারে গোপন মহাদেশ; তার ছোট্টো গোল আর জ্বরের মতো তীক্ষ্ণ শাদা চোখের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে প্রকাণ্ড সব দৃশ্যের রাজত্ব যেখানে উড়তে থাকে চকচকে শাদা রেশমের ঝাঁক বাঁধা মোজা, স্মৃতির প্রাসাদ থেকে ঠিকরে বেরোয় বেহালায় ছড়টানার আওয়াজ, হুল্লোড়, আর পাগল বাজনা, ওখানে দেবতারা বাস করেন; কখনো আবার ঐ লেন্স জলের কণায় কণায় ছেয়ে থাকতো, মাছের উজ্জ্বল প্রতিকৃতিতে ভরে গিয়ে কখনো ঐ লেন্স উঠতো চাপা গলায় গান গেয়ে উদ্ভিদের দেবতাদের জন্য, কখনো ও উড়তে থাকতো হাওয়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে রুমালের সঙ্গে; আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠতো; কখনো বলতো হারিয়ে যাওয়া টেবিলের দুঃখ, কখনো কিছুই বলতোনা, থাকতো তাকিয়ে ভিজে পাটাতনের গায়ে ফাটা দাগের মতো; কখনো শুধু জমিয়ে তুলতো খেদ, যেমন হেমন্ত জমিয়ে তোলে মরণ তার সমস্ত গাছের তলায় আর খেতে সন্ধ্যার আলোর নিচে, কীটদের ও ভালবাসতো; ভালবাসতো পতঙ্গদের যখন ওরা উড়ে বেড়ায় চেতনহীনতার চোখধাঁধানো আলোয়, ভালবাসতো গোপন মাছ যা কিনা অন্তঃস্থলের নীল বরফ ফাটিয়ে ভেসে ওঠে, ভালবাসতো ছোট্টো পাখিদের যখন ওরা দুপুরবেলায় অসীম দুঃখে ভারাতুর হয়ে ওঠে গম্বুজের গায়ের আঁধারে বসে বসে। আলমারির পাল্লার ভেতর থেকে কালো কুচকুচে মখমল রঙ-এর মুখ বাড়িয়ে রেখেছিল ঐ ক্যামেরা, আমার প্রিয়, ছোটো বেলায় দিয়েছিলো উপহার, স্মরণচিহ্ন।

আমার এম্‌নিতে কোনো খেদ ছিলোনা; সারা সকাল কুঁড়েমি ক'রে কাটাতে ইচ্ছে করছিলো জানালার সামনে বসে বসে, আজ আপিসে যাবোনা, যে দিন ইচ্ছে হয়না সে-দিন যাইনে, আজকে তেমন-ই একটা দিন, চারিদিক ধীরে ধীরে শূন্য হয়ে উঠছিলো, সীলিঙ-এর দিকে তাকিয়ে বারবার মনে হচ্ছিলো বড্ডো শাদা, হঠাৎ টান টান হয়ে ঝুলতে থাকা সোনালি কর্ডের নিখুঁত ফাঁস দুলছিলো হাওয়ায়, দড়ির মসৃন স্বর্ণাভ গোছা যেন কারও অসম্ভব চুল হয়ে উড়ছিলো গলার পাশে, কী হবে জানতুম না আমি, তবু ঐ টেলিগ্রাম, যেন ঝরা পাতার মতো, মনে করিয়ে দিলো কেউ আসবে, যাওয়ার সময় হবে এক্ষুনি, যেতে হবে। অথচ এই বিদায়, যা কিনা এই মলিন বাষ্পে মোড়া

শবাধারের গায়ে ছিলোনা লেখা, কোথাও তা যেন ঝন্ ঝন্ শব্দ তুলে বেজে উঠলো, দোর গোড়ায় কেউ কড়া নাড়লো লোহা আর কাঠে তুমুল আর্তনাদ ঘটিয়ে, আমি দরজা খুললুম না, অথচ গন্ধহীন এক রক্তের দাগ চৌকাঠ দিয়ে গড়িয়ে এসে ফণা তুলে আমায় ছোবল মারতে চাইলো, আমি উঠলুম না, দরজা খুললুম না। পাছে কেউ আচমকা ছুরি মারে আমায়। না, না ভয় পাইনে আমি; কিংবা ভয় পেতেই ভালোবাসি। মনে পড়লো পাহাড়ে ভোরবেলায় হঠাৎ বৃষ্টি নামলে কেমন লাগতো; মনে পড়লো মৃত্যুর মতো শাদা হয়ে যাওয়া পাইন গাছের সার ঠিক আমাদের বাড়ির ওপরটায় থাকতো দাঁড়িয়ে, শাদা ওদের ভুরু, সেই ভুরু নত করে ওরা উত্তরদেশের হিম-ঝরানো সূর্যের কথা বলতো, বলতো সেখানকার চাঁদ শক্ত হয়ে উঠে কঠিন হাড়গোড় সুদ্ধ আঙুল বাড়ায় যেখানে গান গেয়ে ওঠে গোলাপ, মনে পড়লো এক প্রিয় কবিতা, 'প্রাচীন শীত' যার নাম, মনে পড়লো সেই হাতকে যে-হাতে ওককাঠ, গোলাপ আর মরণের গন্ধ আছে। অমনি ঐ টেবিলের দীর্ঘ ফাটা দাগ ভরে উঠলো শাদা আলোয়, বরফ ফাটার শব্দ কতদূর থেকে ভেসে এলো হাওয়ায়, কনকনে হাওয়ার গণ্ডগোল ডুবিয়ে দিয়ে হঠাৎ আবার উঠে এলো এক গান ঐ গেলাসের ধবল সুড়ঙ্গ থেকে, কার আঙুলের একটি মাত্র টোকায় বেজে উঠলো অরগান। বাজনা যেন ঐ আঙুলে সে ধরে রেখেছে সব গান, সমর্পণ, উপহার আর নির্দিষ্ট বিলাপ।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম আমি, দরজা খুললুম, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলুম নীচে—এ পর্যন্ত একটি ও লোক আমার চোখে পড়লে না যে কারও অপেক্ষায় ছিলো, সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠছে, ভীড় করছে, ছুটছে, ঘন ঘন তাকাচ্ছে কব্জীর দিকে যেন ঐ কব্জীতে বাঁধা ছোট্টো গোল ঘড়ির মধ্যই রয়েছে ওদের আত্মা, পাছে তা হারিয়ে যায় তাই ভীষণ ব্যস্ত সব। আমি জানি আমার আত্মা ওখানে নেই, তাই ভয় পাইনে, তাই ব্যস্ত হইনা একটুও। এখন কমলালেবু ফেটে গিয়ে ভেতর থেকে আলো বেরোচ্ছে, আমি হাতছানি দিয়ে ট্যাকসী ডাকলুম। বৃষ্টি আর কুয়াশার ভেতর ভেতর ওরা আলো জালিয়ে ছুটোছুটি করছিল পাগলের মতো যেন হলুদ আর কালোয় মেশানো এক বল। এদিক থেকে ওদিকে অবিরল ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি করছে কেউ। ট্যাকসী পাশে এসে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেলো নিঃশব্দে, আর তক্ষুনি আমি পিছু হটে এসে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম ওপরে, ঘরের দরজা খোলা ছিলো হাঁ-কোরে,

কেউ ঢোকেনিতো? না। আমি চেয়ার টেনে শার্সির পাসে এসে বসলুম, নীচে তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার ডাকা ট্যাক্সী, হলুদ-রঙ-এর ছাদ ওর, নম্বরটা পর্যন্ত পড়ে ফেললাম ডব্লিউ, বি, টি ১৩০ আর একটা কিছু হবে, পায়জামা পরা একটি লোক বেরিয়ে এলো; ওপর দিকে, বোধহয় এই জানালার দিকেই তাকালো হাত নাড়লো, বোধহয় গালাগালি দিচ্ছে, ভাবলাম আমি; আর তাকালাম না, ও ঠিক আরেকটু পরেই বুঝতে পারবে, তারপর যাবে চলে। তক্ষুনি হর্ণ বেজে উঠলো সাইরেন বাজনায়, ঝন ঝন করে মত্ত কর্তাল বাজিয়ে যেন দিলো বৃষ্টি, গাছের শিকড় থেকে সমস্ত সোনালি চুল খাড়া হয়ে উঠলো, আর বেজে উঠলো অর্গান; অর্গান আমার, দেবতার, ঈশ্বরের যেন শেষ দান, শরণ, ভিক্ষা, আমি করজোড়ে বসে রইলুম কখন বেরিয়ে আসবে জনহীন মধ্যরাত্রিময় দূর ঘণ্টাধ্বনি থেকে ঝরে তাঁর কণ্ঠস্বর যা গোলাপের লাঞ্ছনায় নিজস্ব।

তাকিয়ে দেখলুম বৃষ্টির মধ্যে, যেমন স্মৃতি, তেমনই সেই অচেনা শূন্য ট্যাক্সী মিলিয়ে গেলো ধীরে ধীরে—এই ভোর বেলায় কুঁড়েমিতে-পাওয়া বুড়ো সূর্যের অলস আর রোগা আঙুল ধরে কুয়াশার ভেতর ঝাপসা এভিন্যু ছাড়িয়ে ঝুঁকে পড়া গাছের দীর্ঘ সারির বিপুল নিবিড় নিয়তি স্পর্শ ক'রে।

কিছুটা কালো স্পর্শ করে যান

INFORMATION CENTRE

একটি গ্রাফিত্তি প্রকাশ

বাসুদেব দাশগুপ্ত

তাহাদের প্রতি

কখন একটি ছ'নম্বর বাস এসে দাঁড়ায় অমল আমায় তুলে দিয়ে আচ্ছা তাহলে আজ রাতে কিরকম কালকে আবার বলাতে আমি ওর অপস্রিয়মান অবয়বের প্রতি ক্ষণিকমাত্র তাকিয়েই টলতে টলতে দোতলায় বাসের সিঁড়ি বেয়ে অগনন সেই সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠতে থাকি যতক্ষণ না পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের পর একবার ব্রেক কষার ধাক্কায় ছিটকাইয়া একটি সীটের উপরে বসিয়া পড়িয়াছিলাম।

হায়, আমার সীটের গায়ে নম্বর নাই।

বাস কেন হুইসল বাজিয়ে চলে যায় না, ট্রেনের হুইসলের শব্দে আমার বিদায় বেলাকার দৃশ্যগুলির কথা বার বার মনে পড়ে যায় যেন দীর্ঘভ্রমণের পরে ক্লান্ত প্রত্যাবর্তন তার সংকেত এই ধ্বনি কেন মনে পড়ে যায় অথচ উৎসব নয় মৌণ শুধু বিদায়ের ক্ষণটিকেই ফেলিয়া চলিয়া গেল। এখন সমস্ত নক্ষত্রগুলি বিপরীত বেগে ছুটে চলে সমস্ত আলোর বিন্দুগুলিই একত্রে বোধহয় পৃথিবীর শেষপ্রান্তে মিলিত হয় সমস্ত আত্মা তাই মৃতদেহের সমস্ত আত্মাগুলি সেইখান হতে আলো নিয়েছিল তারাই আবার আলোর বিন্দু হয়ে অন্ধকারে আলোকিত গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে যায় সেই একাকার শূন্যে চাল বেয়ে আমিও নামতে থাকি যেখানে গিয়ে পৌছব সেথায় ফুলের গন্ধবহ বাতাস।

অমল এখন বাড়ীতে যায় হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে তারপর হয়ত পড়ে বা বসে থাকে শুতে চায় নইলে লেখে লিখে যেতে থাকে ডায়েরী সেই ঐতিহাসিক ডায়েরী তখন যেন সেই ল্যাম্পোষ্টের আলোয় অমলের আবছায়া শরীর এক যন্ত্রণার কাছে গিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় তারপর কাটা ছাগলের মতো। আমি অনায়াসে বাস থেকে নেমে চলে যেতে পারি অমলের ঘরে বসে থাকতে পারি অন্ধকারে কোথায় আমায় তো কেউই দেখতে পাবে না শুধু এক প্রভাতের আলো ছাড়া আর কেউ।

আলোক ফুটিল যেন ভোর হয় যেন ভোর হোল, যিশুর মেষপালক নয় কোন বাইবেল বই এর ছবি সেই মেষপালক ভেড়া চয়াতে চরাতে লাঠি দুলিয়ে যায় ঝরণার ধারে জল ঝরে জল ছিটোয় কে বরফের কুচির মতন জল সেই মেষপালক জল ছিটিয়ে ভেড়া চরিয়ে খোলা পথ বেয়ে যায় কোন ভয় নেই শঙ্কা নেই যিশুর মুখে নয়, কোনও এক মেষপালক ঝরণার সোনালী চুলেতে সূর্যের আভায় কোমল তাই আলো ঝরতে থাকে ভোর হয় তাই ভোর হোল। অমল ঘুমে অচেতন হোস পাইপের জলে টাটকা ভেজা পথে শহরের কয়েকটি কাক তখনও গুন্‌তি গাড়ী কয়েকটির চলার শব্দে বিমূঢ় নয় তাহারা কি সব যেন খুটিয়া খায় রাস্তায় জটলা করে তখন অমলকে জাগিয়ে দিয়ে বলি আমি সারারাত তোমারই কাছে ছিলাম কি আশ্চর্য বলিয়া অমল জানিতে কি আমি তাহাকেই সমস্ত দিতে চাই যে কখনও প্রতিদান দিতে পারিবে না।

আমি ভেসে যাই আমি কি জঙ্গী বিমান উড়ে যাই যেখানে পাহাড়ের গায়ে হলদে পুঁজের মতো থক্‌থকে চীনাসৈন্য সব জমে থাকে শোন জয়ন্ত, একবার চোখ মেরে দাও ওদিগকে যেরকম নিপুণভাবে চোখ মেরে দিতে কলেজের রংমাখা ছল্‌বলে মেয়েদের একবার মেরে দাও চোখ দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার সমস্ত অঙ্গ খুলে যেতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে যেতে বাসের লোকটা ভয় পেয়ে আমায় নামিয়ে দিল। আমি ভাবলাম যেন কে চকিতে হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল জলে ভেজা ঠাণ্ডা হাত কোমল মোলায়েম বুঝি ফুলের রেণু মাখিয়ে দিল গায়ে হাওয়ায় ছড়ালো সেই ফুলের গন্ধ শেফালিকা, তোমাকে যদি ভুলিতে পারিতাম। আমি এগিয়ে যাই, যেতে যেতে বাঁশের সাঁকো দেখতে পেলাম দুলছে যেন কেউ নাড়িয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল তাই নীচে জলে ঢেউ সেই তালে তালে দুলে যায় সাঁকো বেয়ে আমি একা চলে যাই জলে আমার ছায়া পড়ে সেই ছায়া থেকে অনেক ছায়া বেরিয়ে এলো উঠে এলো চলতে শুরু করে দেয় আমার আগে আগে ওদের পিছনে আমি এগিয়ে পাতলা বন বড় বড় গাছের পাশ দিয়ে সরু মেঠো পথ ঘাস নেই চলতে চলতে কোথায় যেন হারিয়ে যাই। একটা গাছের নীচে শাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে লেজ দিয়ে গায়ের মাছি তাড়ায় তেলচুক্‌ চুকে শরীরে আমি ঘোড়ায় চড়ব অথচ আমার ছায়াগুলি আরও এগিয়ে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আরও ভেতরে যাই সামনে বালির মাঠ ঢেউখেলানো চাঁদের আলোয় মসৃন নতুন চরের মতন, দুএকটা ঝোপঝাড় থেকে সজারু বেরিয়ে ছুটে যেতেই ছায়াগুলো এইবার নাচানাচি করে

হারিয়ে গেল বালির ঢেউয়ে সেইসাথে একরাশ হাওয়া বয়ে গেল তারপর শুষ্ক প্রান্তর চাঁদের আলোয় সব পরিষ্কার অথচ কেউ কোথাও নেই ওরা সব কোথায় ? একটা দিন কি পুরো কেটে যায় ? আপনারা সব আসুন। হেথায় নৈশ বনভোজন হবে আসুন আপনারা আমি একা কী করব ? আপনারা সকলে ছুটে আসুন। আমি তো আপনাদের সবাইকেই চাই অথচ আপনাদের সাহচর্য আমাকে প্রতিদিন দূরতর করিয়া তুলিতেছে। আমি চাই, আমি আপনাদের সবাইকে চাই। আপনারা সবাই আসুন।
আমি তো ভুলিতে চাহি না।

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা প্রতিষ্ঠাবিরোধিতা উস্কে দেয় আপনাকে নিজের বিরুদ্ধে ভাবার জন্যও শুধুমাত্র আনন্দবাজার বা দেশ নয়। কারণ নিজেকে আক্রমণের অর্থই ভাষাকে আক্রমণ। নিজের অবস্থানের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে এই এগোনো, এই চিৎকার। নিজেকে চিহ্নিত করার এই উপায়, নিজেকে নিজে নির্বাসন দেওয়ার মতো কোনো কিছু।

অনন্য রায়

তরল হাতঘড়ি

"কোথা বশ্য নিসর্গের সুস্বাদু মেশিনরতিতন্ত্র ?' এই উপাস্তের বিবমিষা থেকে
নভোশ্চর
বিষাদে, মাংসল মর্ত্যে, অনেক ঘুরেছি আমি পৃথিবীতে ভূল স্বপ্নে সাতাশ বছর
বেলাতটে ; লক্ষ্য করে লাল অর্ককাঁকড়ার আহ্নিক-আকার আর মেঘাবৃত জলজ
ডালপালা পাললিক
সাপের সঙ্গমদৃশ্য-আঁকা তন্ত্রমন্ত্রে আমি লিখে গেছি কোয়ার্ক-লিপ্ত মহাজাগতিক
কোয়ান্টাম-সংকেতধ্বনি : নিহত-ঈশ্বরবিন্দু ; (পা টল্‌মল্ করে ওঠে রাষ্ট্রসঙ্ঘ-
শাঁখের শীৎকারে !)
ওঁ মাতৃজঠরের নীলকান্না, অরণ্যের বোবা বিবর্তন : আমি দুই হাতে মৃহ্যমান
কান চেপে ধরে
চেয়ে দেখি ঋতুমতী প্রাক্-ক্যাম্বিয়ান হল্‌দে স্যাঁতসেঁতে জলাভূমি চিরে
ছুটে গেলো নীল ট্রেন ক্ষিপ্রগতি—
ইতিমধ্যে কোথা থেকে চকিতে গড়িয়ে আসে আমার পায়ের কাছে নুড়িপাথরের
মতো তুল্‌তুলে বিস্মৃতি :
শাদা ডিম : যার মধ্যে উঁক মারছে উদ্ভিদের পুঞ্জীভূত চেরাজিহ্বা-ওঙ্কারসমূদ্র
যেখানে সাঁতার কাটছে তিনজন কবন্ধ ডুবুরি ; ডানাঅলা ; মীনপুচ্ছ ; নাতিক্ষুদ্র
মাছের ফুশফুশ থেকে অঙ্কুরিত বুদ্বুদের কোলাহলে মনে হচ্ছে যাদের ছায়ার
সংখ্যা পাঁচ :
এই স্বপ্নদৃশ্যে আমি কফিতে চুমুক দিতে চিড় খেলো কামরাঙা ঝরোকার কাচ।

মাংসের ফাটল দিয়ে ছাখা যায় তুঁতেনীল অক্সিমোরোনের চাঁদ ! স্বরব্যঞ্জনের
চির-চৌচিরের বজ্র !
এ-সময়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো হয় গ্ল্যাসক্যাস্‌লের দুগ্ধশ্বেত উরুর ফেনাবগাড়
রাজহাঁসের বর্ণমালা : রক্তমাংসে স্কার্লেট-ভাস্কর্য···
আফ্রিকার ঢেউ-তোলা কালো কার্পেটের পরে হাইহিল্ জুতো ঠুকে রাত্রি হেঁটে
চলে বিষ্ণুপ্রিয়া

মৃত্যুর ট্যাপেস্ট্রী সূচ কেবলি উৎকীর্ণ করে পদচিহ্নে নক্ষত্রকুসুম ; (হায়,
বেঁচে থাকা : শাদা ক্যামেলিয়া !)
সমস্ত আকাশ যেন কালো ময়ূরের কস্‌মো-পেথমে উজ্জ্বল নীল যোনিচিহ্ন :
শর্বরীর কাসাণ্ড্রা-বাত্যায়
নক্ষত্রকুকুর তার কালের ঘণ্টার ধ্বনি শুনে লালা-নিঃসরণে আলো জন্ম ছায়
নীল ঘুমে স্বপ্নচারী আমি পান করি হিম কালো অপেরার চির বুদ্বুদের মদ
এ-সময়ে কোথা থেকে ডানা মেলে অঙ্গারের পরী এক ; (তারার বল্লমে কাঁপে
উরুর নির্জন নীল-নিউট্রিনোর হ্রদ)
আমি সেই নর্তকীর কালো দুধে স্নান করি ; গায়ে মাখি আমিষ আদিমতম
জন্তুর দুর্গন্ধ !
জ্যান্ত জীবাশ্মের মতো শরীরে উৎকীর্ণ করি কালো শর্করার মধু, কালো সূর্য :
ক্যাক্টাসের ছন্দ !
কালো কৃষিশাস্ত্র ! হায়, অহল্যার অবলুপ্ত নৈশ-এশিয়ার কালো পালকের
ঝরা-অমরতা !
মাংসল মানচিত্রে শুধু ক্লান্ত সৈন্যদের মতো ভাড়াটে আকাশ তার নাক্ষত্র-কুর্নিশ
ঠুকে আমাকে জানায় ঘৃণ্য শ্বেতসাম্রাজ্যের শস্ত্র বত্রিশ নাড়ীর নিষ্ফলতা !
গর্ভ-প্রহেলিকা থেকে অন্ধকক্ষে লক্ষ্য করি গগনেন্দ্রনাথের সিঁড়ি উঠে গেছে
অজানায়, আরো দূর ক্ষুধাতুর ভেনিজুয়েলার চুল্লি বেয়ে—
যেরকম বেড়ে ওঠে কাচের বয়ামে কামাতুর মানিপ্ল্যান্ট : যেন মায়ের পেলব স্পর্শ ;
(মা যখন সিল্কের শেমিজ-পরা বারো বছরের কচি মেয়ে—
আর আমি বাহাত্তুরে বুড়ো !) ; শুনি কক্ষান্তর থেকে ভেসে আসা কোনো,
কৃষিবালিকার কান্না—ক্রীটের ক্রন্দন
নভোশ্চারী রান্নাঘরে দ্রাক্ষারসে-চোবানো পারস্ত ; আমি গ্রীসের সোনালি মাংস
করেছি সেবন
সস্‌প্যানে ঝল্‌সে ওঠে ট্রয় ; হরপ্পার আঁশ ; কুমারী কার্থেজ তার
স্তনমশলামাখা কামজর নিয়ে উঠে আসে নাক্ষত্র-ডিনারে—
এল সালভাদোর থেকে ঘৃণ্য বুলেটের শব্দে লুপ্ত লিঙ্কনের লাশ
আতঙ্কে চুমুক খায় কালো কফি-ক্রেটারের আগ্নেয় পাহাড়ে
রোমশ ড্রামের শব্দে কুঁড়ি-মেলা ক্রিসেন্থিমামের চুল্লি ঘিরে গ্রহপতঙ্গের
ঝাঁঝালো সবুজ মৃত্যুরতি :

ক্রিমসন-রাঙা রশ্মিশিশুদের সাবড়ে দিচ্ছে স্বপ্ন একচুমুকে , ওড়ে বজ্রের
রূপোলি প্রজাপতি
মর-মেট্রোপোলিসের মেঘের মাৎসর্যে , মাংসস্ফুলিঙ্গের থেকে ঝলসে ওঠে
'চ্ছিন্ত ইলেক্‌ট্রো-মেধার গলনাঙ্ক
(তখন স্কুলের শেষ বেঞ্চে বসে হিসি কোরে গ্র্যাভিটনবিন্দু কাঁদে
প্রতিদিবসের নোনা অঙ্ক)
এ-সমস্ত দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন বা ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে উল্টোদিকে : তার তরল
ডায়ালে সংখ্যাচিহ্ন
ক্ষিপ্র প্রদক্ষিণ করছে ভাঙা বাইসাইকেলে চোরা-আরোহী আমার কচি বাবা
শতছিন্ন…
এস্কিমো-পোশাকপরা সাত বছরের শিশু যখনই কামার্ত হই ছিন্নমস্তা মূর্তি দেখে:
সে রোমাঞ্চে 'টুং' শব্দে ভেঙে পড়ে কাচের গেলাশ
ভাঙা টুকরোগুলো আমি যখনই সজ্জিত করি নিষ্ফল সংসারে ; অগ্নি তুরুপের
তাশ
মৃত্যু ছুঁড়ে মারে তার স্বপ্নহীরকের আংটি-পরা পেন্টাগন নোনা হাতে
এবং তখনই চাঁদ ঝুলে পড়ে তেজস্ক্রিয় ব্যাঙের মতো দগদগে মেঘের
ফাঁসিকাঠে
মাতাল ব্রহ্মাণ্ডবাবু 'একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব'-নামের মহুয়া খেয়ে স্বপ্নে গলে পড়ে
এই হল্‌দে কুহকের উর্বর মেহনদৃশ্য চাঁদ গোর খায় রোজ সবুজ মাকড়শা
সেজে ভয়াবহ টারাণ্টেলা-নৃত্য শুরু কোরে :
কলকাতা যেনবা ডুবো বাণিজ্যজাহাজ এক ; শহীদমিনার যার নাক্ষত্র-মাস্তল
নিপ্পন-উর্বশী তার পেস্তাচেরা চোখে ডাকে আমাকে কোষের
হিরোশিমা-বিস্ফোরণে কাল্‌চে চাঁদের কোঁকড়ানো তেজস্ক্রিয় এলোচুল !
এই বিভ্রমের থেকে জন্ম নেয় বৈদ্যুতিক বাল্বে বৃত বৈবাহিক আমার 'অপর' :
মাংসের ভলক্যানো থেকে তখনই ঠিকরে পড়ে শ্বেতপাথরে পায়রা,
শাশ্বতের জ্বর
মৃতা প্রেয়সীর জ্যান্ত উপস্থিতি হানা খায় নেপচুন নগরীর হাই-তোলা রাস্তার
শিহরে
তার ন্যাংটো কঙ্কালের ধর্মশাস্ত্রে স্রস্ত হয়ে নেকারবোকার-পরা সাত বছরের
শিশু আমি নপুংসক হই বৃষ্টিভেজা ইগলুর ভিতরে।

ও সমুদ্র, নু-বালার্ক! হিস্পানী ষাঁড়ের মতো ছুটে-আসা ঢেউ : যেন
ক্ষুধামৃত্যুযৌনতার একক সংকেত-ক্ষেপনাস্ত্র
বৃহস্পতি-স্যাটার্নের কর্ক খুলতে উথ্‌লে-ওঠা মেঘের ঝলসানো লাল মাংসবিম্বে
সূক্ষ্ম কোষপ্রযুক্তির শাস্ত্র
পাপগ্রস্ত সাতবার শো-মোশানে চিড়-খাওয়া শ্লথ মায়াদর্পণে নিহত হয়ে
কেন ফিরে আসে সেই বিষাদের বায়োনিক্স-অবৈধ রমণী
ভূষারহরিণী হয়ে?···লিপ্সা প্লেজ টানে শনিগ্রহে, আর বেজে ওঠে ইউরেনাসে
পিজরেপোল-লোকোমোটিভের শঙ্খধ্বনি···
পেট্রোলিয়ামের স্বর্গে পাশা খেলছে সর্বস্বান্ত প্লুটো; শাদা সাপের ডিমের মতো
চেরাজিহ্বা পরজীবী ম্যাক্রোদৈত্য শুক্রের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে···
এ-সময়ে মঙ্গলের থার্মোস্ফাস্ক ফেটে যেতে আমার ওষ্ঠের কোণে কামার্ত কষের
থেকে ধরিত্রীস্পৃহার রক্ত ঝরে—
এবং যখন অন্ধকক্ষে আমি নিজের মৃত্যুর সঙ্গে রতিলিপ্ত : উঁকি মারে অ্যাটমের
ঝিনুক-ঝরোকা খুলে ক্ষিপ্র মায়াবাস্তব-কণিকা···
(পরস্পর উপরারোপিত নীল তিস্তার পেলব স্রোত-তবু বয়ে চলে সঙ্গে নিয়ে
শিলীভূত বজ্রফেণার উপল হার্মোনিকা!)
ওগো বলাৎকার-করা বাংলাদেশ : কুমারী কাসাণ্ড্রা! (হায়, বিষাদের শাদা
ক্যামেলিয়ার কুমারী!)
কস্‌মো-অঙ্কুরের ঘুমে চেয়ে দেখি পরিত্যক্ত শঙ্খিনী-পৃথিবী ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে
পারঙ্গম উরুরকেটের স্বপ্নচারী
রাষ্ট্রদূত; পড়ে থাকে মর্ত্য-ইমাগোর ছাই, রক্তের আর্নেস্তো চে-র
পোড়া চুরুটের চুল্লি : নবপ্রজন্মের কৃচ্ছ্রতায়
মৃত সৈনিকের হাতে অর্ধভক্ষ্য আপেলের মতো এক রক্তাক্ত নস্যাৎ শুধু
ডানা মেলে প্রাপনীয় সুখী পৃথিবীর শূন্যতায়···
অন্ধ শ্বেত বিলিয়ার্ড বলের মতন শ্রান্ত নিউট্রন-নক্ষত্র তখন পোড়ে মেহগনি—
ঘুমের গহ্বরে; বাস্তবতা
কোথা বন্য নিসর্গের সুস্বাদু মেশিনরতিতন্ত্র খুঁজে সাতাশ বছরে পায় শুধু
অক্ষরের বিবমিষা···হায়, সিল্কমসৃণ শূন্যতা!

শর্মী পাণ্ডের লেখা

দুই ফাঁক দুই বা সাতানব্বই

লোহার তাঁবু থেকে ঝুলে পড়া শব্দরা নামে
খাঁচার ভেতর কে তুমি
সোনার পাখী দানা খাও হাগো
দাঁড়ে বসে এই দড়িলাফ শুরু
চোখ বন্ধ অন্ধ আলোয় যে যার দিকে চোখ অথবা বাড়িয়ে
আমরা সুসজ্জিত মাদুরে মোড়ানো
বেলা ৯টার হুইসেলে কে তুমি কোয়েলিকা
বাঁশি মারো আহা প্রভুহে পুলিশ হে
বৃষ্টিতে দোমড়ানো স্পাইনে লেখা কিছুটা বাতাস
তোমরা ছোঁবে না
কিছুই না কতোকটা মাটি পড়েছিল রেখেছে
এটাই আর্ট বাবা ওটা কি এটা বড়দের
একি বিড়ি খায় না না ছুঁও না ওটা রাক্ষোস কত কিলো
তারপর
রোজ দাঁত মাজি ঘুম যাই হি হি আমাদের প্রগতি
বিশু শেষ মেশ ল্যাঙ মেরেছিল তাই মাঝপথে থম্‌কে গ্যাছে
আজো ঘরে ফেরে নাই
ঝাঁট দেওয়ার আর সময় পেলে না গিল্ডকে ডাকো বিক্রিটা বড়নয়
মাথার ভেতর ফিতে জড়ায় শব্দরা ভ'রে যেতে থাকে খুব পাশে
কোথাও ঘুম যায় সমস্ত সময় হাজার পাওয়ারের আলোরা
দিন করে রাখে আর লোহার চাঙর বেয়ে
টুপ ক'রে নেমে এসে শীত
তোমার মাথার উপর ঠিক কোন বিন্দুতে জ'মে গিয়ে
ঝ'রে পড়ে এইখানে নয় অন্য কোন খানে

আজ রাতভোর জল চল্‌কায়
ছলকিয়ে ওঠে শব্দের রঙ আমাদের ধার ভেজে
সাদা শূন্যতায় ধেবড়ে যায় ড্যাম্প ধরা বুক
বাড়িয়ে স্পট বাল্বের খুব কাছে বসি
পাতারা খুলে আসে এই ভয়ে সারিসারি
চাপা দিয়ে রাখা ইতিহাস মাথার ভেতর
তিরপলের ফাঁক দিয়ে শত্রুরা আসে প্রতিরাত
জোরের ভেতর তবে এ্যাতোটা আকাশ থেকে গ্যাছে

19. 3. 97 বা ফাঁক দুই বা 19 ফাঁক 3 বা 97

ডেটলে চুবোনো সকাল টান টান মেলে দেওয়া
জলের দাগ লাগা রদ্দুর তেলচিটে গন্ধের আলো
ঝুপ ঝুপ নেমে পড়ছে খাঁজে আর হাড়ে
লাটাই জড়ানো এই রোদে লেগে থাকা আঁশ আর স্বপ্নের কুচি
জন্মের জন্য ছেড়ে দেওয়া ফাঁক গর্তে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে লোম
আর কালোর ছিট ঢাকা যৌনতা আমাদের দরজাহীন
বাতাসের দেওয়াল সাজানো গোপনীয় ঘরের জানলা ফুরফুর
হাওয়া খাচ্ছে জুবুথুবু আকাশের গায়ে
কখনো ওড়ার কোনো বাসনাই জানে না য্যানো!
এ্যামন করে পাখাদের উগ্‌রে দিচ্ছে দুহাতে আর অসংখ্য শহর
ধীরে ধীরে জমে উঠছে খুব ফু দিয়েও যাদের সরানো যাবে না
তার প্রতিটা ফাঁক ঘিরে নিচ্ছে যন্ত্রের সিডিউল-ড্রাগ
গরাদেরা জড়াজড়ি পাকিয়ে নিরুপায় দাঁড়িয়ে আছে
কাট গ্লাস ঝোলানো পর্দার দিকে য্যানো কোনো হাত
এখুনি সরিয়ে দেবে
ঝেড়ে দেবে সমস্ত শহর

31. 3. 97 বা ফাঁক তিন বা 31 ফাঁক 3 বা সাতানব্বই

দরজা বন্ধ একটা নিজস্ব পৃথিবী যা ঘিরে আছে অচেনা রঙের সব দলা আর রেশ রঙ যা ভীষণ ভাবে তার নিজস্ব খোপে আঁটা পুরোটা শরীর এক হয়ে গেলেও দুটো ধুকপুক আলাদাই থেকে যায় দুটো স্রোত রক্তের দুটো পায়ু দুটো রন্ধ্র কি ভীষণ সচেতনতায় পৃথক কাজ করে চলে সেভাবেই হাজারো বছরের যুগ্মতায় ধারাবাহিক নিজস্বতার ইতিহাস চাপা পড়ে যায়

এ্যাতোগুলো রাত্রি জোড়া আঁধার দুভাগে প্রতিদিন বিভক্ত ছিন্ন হয়ে হয়ে অন্ধকার এ্যাতটা নিজস্ব যে হঠাৎ দেখলে পরে অন্য রঙ বলে ভুল হয় হয়তো বা কালো নয় য্যানো খয়েরী সবুজ অথবা গোলাপির সেড যা অন্য কিছু অন্য কোন কালো তবু আমাদের অন্ধকার নয় কোনদিন এই রাত্রিগুলো একই সাথে পাশ থেকে দু-জন ধ'রে থাকি পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেছি ভোর থেকে চাঁ চাঁ রোদ্দুরে হল্‌দেটে আলো ঘেরা এই ঘর শহরের ইতিহাস বলে পুরোনো পরীর গলে যাওয়া সখ আদরে জামায় ফুটো ফুটো মদ থেকে চুঁয়ে আসে আকাশের ঘাম ক্লান্ত হাত দু-পাশে ছড়ায় জানলা আমার এই খোপের ভেতর থেকে পাখীর মতোন সব পোকা অথবা জন্মের মতো সব পাখী বাতাসে ওড়ে ফড় ফড ডানা ঝাপটিয়ে ছুঁড়ে ছায় অনেকটা সকালের গুঁড়ো সূর্যের গায়ে সোনালীরা নীল হয়ে আসে ভ'রে ছায় ক্রমাগত
অন্ধকার সরা এই ফাঁক

জোড় শক্ত করার জন্য নিয়মিত আমরা ভোরের বেলায় গুঁড়ো স্বপ্নের দলা গুলে ফেনা বড় করি ডুব দিই রঙিন বুদ্ বুদ আর অসংখ্য মাছের ছায়া মেখে চাপ দিয়ে রাখি সব হাত অনায়াস গলে যাওয়া রাত আর অনেকদিন খুঁজে না পাওয়া শব্দেরা ছায়ার ভেতর মাছ হ'য়ে কিলবিল করে ধাক্কা ছায় আমাদের উষ্ণতা ছুঁয়ে যাবে বলে

7.3.97

এই ঘর জুড়ে স্মৃতির আগুন ফর ফর পাতার শরীর
অসম্ভব পাখীর মতো জেগে ছাই স্তূপ রাস্তারা
গতিমান গাছের গভীরে স্থীর বসে থাকা জলের
প্রবাহ ঘিরে কয়েকটা সবুজ পড়ে আছে জেব্রাক্রশিঙে
এই শালা নচ্ছার শব্দের রোগ ভাষার অসুখ সাজানো
আইভরি সকাল গোমূত্রের টাক্না লাফানো পিতৃপুরুষ লবি
আমাদের আঁকড়ে ধরে চিমনি দিয়ে নির্গত প্রতিদিন
পলিব্যাগ মুড়ে রাখা আগুনের ঘুম আর
বিজাতীয় শব্দের চারকোল আর আমাদের এই
কাঠামোর ঢ্যালা আর এক হ'য়ে পড়ে থাকা
নিরুপায় এ্যামন সময় বৃষ্টিরা উড়ে যায় প্রায়
শকুনের চোখ আকাশে বাড়িয়ে ছাথে

অঁতনঁ্যা আর্তো

পল গর্গ্যাঁ

রলাঁ বার্থ

শুভঙ্কর দাশ

শঙ্করনাথ চক্রবর্তী

দীপঙ্কর দত্ত

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

অমিত মিত্র

অরুপরতন বসু

বাসুদেব দাশগুপ্ত

অনন্য রায়

শর্মী পাণ্ডে

একটি গ্রাফিত্তি প্রকাশ

সম্পাদক ☐ শর্মী পাণ্ডে

গ্রাফিত্তির পক্ষে ২এ টিপু সুলতান রোড কলকাতা-২৬ থেকে প্রকাশিত এবং
দীপঙ্কর প্রেস ২/১এ আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

দশ টাকা